সারস্বত লাইব্রেরীর উপন্যাস-গ্রন্থাবলীর তৃতীয় গ্রন্থ।

সতীর পতিপূজা

পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য বেদান্তশাস্ত্রি-প্রণীত

সারস্বত লাইব্রেরী,

১৯৫।২ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

চতুর্থ সংস্করণ

বৈশাখ, সন ১৩৩১

মূল্য ২৲ দুই টাকা।
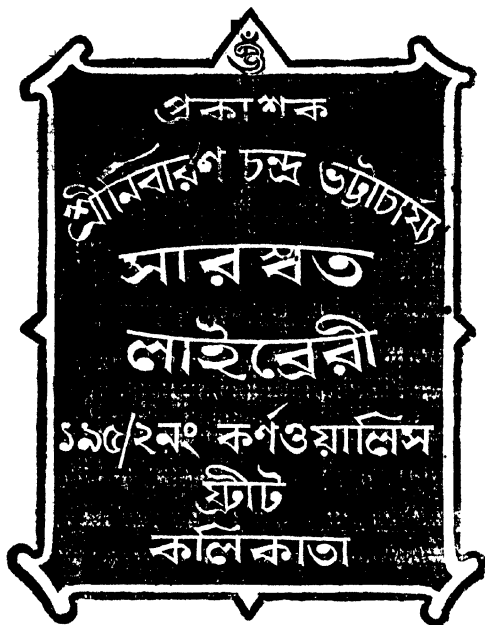
১ম সংস্করণ—১৩২৭—বৈশাখ।

২য় সংস্করণ—১৩২৮—বৈশাখ।

৩য় সংস্করণ—১৩২৯—আষাঢ়।

৪র্থ সংস্করণ ১৩৩১—বৈশাখ।

সারস্বত প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্

প্রিণ্টার—শ্রীনিবারণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

৩ডি, নিবেদিতা ব্রাগবাজার, কলিকাতা।

উৎসর্গ

সারস্বত লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠাতা, সংস্কৃত-মহামণ্ডলের

সম্পাদক, দেশবিখ্যাতবাগ্মী, পণ্ডিতপ্রবর

শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র স্মৃতিতীর্থ

মহাশয়ের কর-কমলে

এই গ্রন্থখানি

আন্তরিক প্রীতির নিদর্শন-স্বরূপ

সাদরে অর্পিত হইল

গ্রন্থকার—

উপহার পৃষ্ঠা

স্বাক্ষর—

তারিখ

মূলের কথা।

ইন্দ্রিয়াধীন পথহারা দিগ্‌ভ্রান্ত অনেক পতিত যুবকের স্ত্রী বর্ত্তমান শিক্ষার জন্যই হউক আর হৃদয়ের বলশূন্যতার জন্যই হউক, স্বামীর উপর অশ্রদ্ধা করিয়া—স্বামিপূজা হইতে বিরত হইয়া চিরজীবনের মত স্বামিসোহাগে বঞ্চিত হইয়া যান। আর তাঁহার স্বামী আজীবনকাল প্রেতজীবনের মর্ম্মবেদনা লইয়া নরকে বিচরণ করিতে থাকেন। তাঁহাদের সংসার ছারেখারে যায়, দাম্পত্যসুখ অন্তর্হিত হয় এবং সাধারণের চক্ষুতেও হেয় এবং নিকৃষ্টজ্ঞানে সমাজের এক পার্শ্বে পতিত হইয়া জীবন কাটাইতে থাকেন। কিন্তু সতী স্ত্রীগণ যদি পতি-দেবতার নিত্য আরাধনা পরিত্যাগ না করেন,—পতি বীজমন্ত্রে ধ্যান ধারণা, মানস পূজা ও প্রাণাদি আত্মসমর্পণ করেন, তাহা হইলে, তাঁহার স্বামী প্রেতত্ব পরিহার পূর্ব্বক পুনরপি দেবতা হইতে পারেন।

তেমনই এক সতী স্ত্রীর নিজের মুখের কাহিনী শুনিয়া এই গ্রন্থ লিখিত হইল। ভরসা করি, ইহা পাঠে স্ত্রী ও পুরুষ, উভয়েরই কিছু উপকার হইবে। উপন্যাসপ্রিয় পাঠক পাঠিকার এ উপন্যাস পড়া নিতান্ত মন্দ নয় বলিয়া মনে করি। এরূপ শ্রেণীর—এরূপ ভাবের আখ্যায়িকাকে ঠিক উপন্যাস না বলিয়া কাহিনী বলাই উচিত। কিন্তু বর্ত্তমানে বিভিন্ন দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণ ইহাকেও উপন্যাসের অন্তর্গত করিতেছেন বলিয়া, আমরাও করিলাম। নিবেদন ইতি।

শ্রীসুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য।

অনন্তপুর, নদীয়া,

২৮শে চৈত্র, ১৩২৬।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

দশ মাসের মধ্যে "সতীর পতি পূজার" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল এবং অনেক অযাচিত প্রসংশা পত্রও আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি, সুতরাং এই পুস্তকখানি যে বঙ্গের পাঠক পাঠিকার প্রীতি উৎপাদন করিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহাতে আর সন্দেহ নাই। ইতি

সন ১৩২৭ চৈত্র।

প্রকাশক।

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

প্রথম সংস্করণের ন্যায় ২য় সংস্করণও দশ মাস মধ্যেই নিঃশেষ হইয়াছে, "সতীর পতি পূজা" বাঙ্গালী পাঠক পাঠিকার শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছে, সন্দেহ নাই। ইতি

সন ১৩২৯, আশাঢ়।

প্রকাশক।

চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

এ সংস্করণও অতি অল্প সময় মধ্যেই নিঃশেষিত হওয়ায় ইহার চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হইল, এ সংস্করণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সংস্করণ অপেক্ষা কাগজের উৎকর্ষণ সাধিত হইল ইতি

সন ১৩৩১, বৈশাখ।

প্রকাশক।

সতীর পতিপূজা

প্রথম উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

পরিণয়।

আমার বয়স তখন আট বৎসর; মাঘ মাস, খুব কন্‌কনে শীত। সেই শীতার্ত্ত প্রকৃতির বিষণ্ণ, বিস্তৃত বাহুর মধ্যস্থলে এক দিন নীল-চন্দ্রাতপে আমাদের বাড়ীর প্রাঙ্গণ আচ্ছাদিত হইল এবং তাহার তলে সানাই-টিকারা বাজিয়া উঠিল। সে ১৩১৪ সালের মাঘ মাসে।

তাহার তিন চারি দিন পূর্ব্ব হইতে আমাদের বিস্তীর্ণ বাড়ী-খানি কুটুম্ব-কুটুম্বিনীতে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। আমার বয়সের অনেক ছেলে মেয়ে আসিয়া জুটিয়াছিল,—যদিও তাহারা আমার পূর্ব্বপরিচিত নহে, তথাপি আমাদের আত্মীয় জানিয়া আমি তাহাদের সঙ্গে খুব মিশিয়া পড়িয়াছিলাম। বাজনা শুনিয়া যখন

আমরা সকলে মিলিয়া প্রাঙ্গণে ছুটাছুটী করিতেছিলাম, সেই সময় কে একজন আমাকে বাড়ীর মধ্যে টানিয়া লইলেন, চারিদিকে হুলুধ্বনি হইল,—মঙ্গল-শঙ্খ বাজিয়া উঠিল এবং বৌমহদ্‌বর্গের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে আমার গাত্র-হরিদ্রাকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইয়া গেল। শুনিলাম আমার বিবাহ।

দিবসত্রয় গাত্র-হরিদ্রার অসীম আনন্দ-উৎসবের পর ২৭শে মাঘ আমার শুভ বিবাহ সম্পাদিত হইয়াছিল। বিবাহ খুব আমোদ-আহ্লাদেই সুসম্পন্ন হইয়াছিল। হইবারই কথা; কারণ আমার শ্বশুর শাশুড়ী জীবিত ছিলেন, এপক্ষে আমার পিতা-মাতা ও দিদি-মা জীবিত ছিলেন। আমি পিতা-মাতার আদুরে মেয়ে ছিলাম। উভয়পক্ষই অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। কাজেই উভয়পক্ষেই সম্ভব মত যতদূর আমোদ-আহ্লাদ হইতে পারে, তাহা হইয়াছিল।

তখন জানিতাম না, যে বিবাহের জ্যোৎস্না-যবনিকার অন্তরালে কত মহৎ উদ্দেশ্য, কত হাসি-কান্না, কত সুখ-দুঃখ, কত সাফল্য-বৈফল্য, কত আলোক-অন্ধকার, কত জীবন-মরণ বসতি করে। তখন বুঝিনাই, যাঁহার সহিত বিবাহ হইল, তিনি আমার সারা জীবনের জীয়ন-মরণকাঠি, কাজেই তাঁহার বা তাঁহার স্বভাব-চরিত্র, তাঁহার বংশপরিচয় জানিবার এতটুকু প্রবৃত্তিও মনে জাগে নাই, শুধু সেই সপ্তদশবর্ষীয় যুবকের উপর বালিকা-বুদ্ধির স্বামিত্ব ও আমিত্বের এতটু পাতলা ছাপ দিয়া এবং উজ্জ্বল হৈমালঙ্কারের

বিষম ভাবের বোঝায় সমস্ত দেহ ভারি করিয়া লইয়া আনন্দে ভাসিয়া বেড়াইতাম। তার পর? তার পর যাহা ঘটিয়াছিল, তার পর যাহা শুনিয়াছিলাম, তার পর যাহা জানিয়াছিলাম, তার পর যে যন্ত্রণার দারুণ-দাবানলে জ্বলিয়াছিলাম, তাহাই জানাইব বলিয়াই ত, আপনাদের সম্মুখীন হইয়াছি।

দ্বিতীয় উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

শিক্ষা।

এখন জানিতে পারিয়াছি যে, আমার পূজ্যপাদ শ্বশুর মহাশয় কলিকাতায় এক মহাজনের অধীনে কার্য্য করিতেন। কিছুদিন পরে মহাজন মহাশয় মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে, আমার শ্বশুরের উপরেই সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হয়। তিনিও উর্দ্ধতন কর্ম্ম-চারী হইয়া তাঁহার নিম্নস্থ কর্ম্মচারীদিগকে ভদ্র-ব্যবহারে তুষ্ট রাখিতেন, তাঁহারাও তাঁহাকে যথোচিত মান্য করিয়া চলিত এবং মনিবের কার্য্য সম্পাদন করিয়া শ্বশুর মহাশয় অল্পদিন মধ্যেই সমধিক যশস্বী ও বিশ্বাসভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পুত্রকে কলিকাতায় তাঁহার নিজের কাছে লইয়া গিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষার জন্য নিয়োগ করেন। সে সময় তাঁহার বয়স একাদশ বৎসর;— দেশে তখন ভাল স্কুল ছিল না এবং ভবিষ্যতে পুত্র সহরের উন্নত বিদ্যালয়ে, বিদ্যাভ্যাস করিয়া অত্যুন্নতি লাভ করিবে, এ আশা হৃদয়ে পোষণ করিতে লাগিলেন। পুত্র কিন্তু, বিদ্যাভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে কুসঙ্গ পাইয়া কুক্রিয়াসক্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন। আমার

শ্বশুর মহাশয় অত্যন্ত সুচতুর লোক ছিলেন, তাঁহার নিকট কিছুই গোপন রহিল না; কাজেই তিনি পুত্রকে আর সহরে রাখা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিলেন না। ময়মনসিংহ-জেলাস্কুলে বিদ্যা-শিক্ষার জন্য পাঠাইয়া দিলেন, কিন্তু ফলে আরও বিপরীত ফলিল,—কলিকাতায় পিতৃ-শাসনের যৎকিঞ্চিৎ ভয় ছিল; ময়মনসিংহে আসিয়া তাহাও ঘুচিয়া গেল। এদিকে বয়সও কিশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইল। তিনি লেখা-পড়া পরিত্যাগ করিয়া কেবলই বিলাস-সাগরে গা ভাসাইলেন। সংবাদ পাইয়া, শ্বশুর মহাশয় বুঝিলেন, লেখা-পড়া আর হইবে না; তখন ময়মনসিংহ হইতে বাড়ী লইয়া গেলেন এবং আমার সহিত মহাসমারোহে বিবাহ দিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি আমার স্বামীর বয়স তখন সপ্তদশ বৎসর।

তৃতীয় উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

বাসনা-বহ্নি।

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুর মহাশয় বড়বাজারের কোন এক মাড়োয়ারির কার্য্যালয়ে কার্য্য স্থির করিয়া আমার স্বামীকে পত্র লিখিয়া পাঠান, "তুমি যত শীঘ্র পার, এখানে চলিয়া আইস।" স্বামী মহাশয় পত্র পাঠ করিয়া বড়ই আনন্দ অনুভব করিলেন; কারণ তিনি বুঝিতে পারিলেন, কলিকাতায় গেলে তাঁহার ব্যসন ও বাসনা-বহ্নিতে উত্তমরূপেই ঘৃতাহুতি পতিত হইতে পারিবে। মানুষ অন্তরের সহিত যাহা চায়, তাহাই পায়; তিনি সর্ব্বদা যাহা মনে মনে কল্পনা করিতেন—প্রার্থনা করিতেন, ভগবান্ তাহাই মিলাইয়া দিলেন। পত্রপ্রাপ্তির কয়েক দিন মধ্যেই যথোচিত আয়োজনের সহিত আনন্দোচ্ছল-হৃদয়ে হাসি-মুখে বাটী হইতে বিদায় লইয়া কলিকাতায় গমন করিলেন এবং পিতৃ-আদেশ ও নির্দ্দেশে মাড়োয়ারির কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কলিকাতা মহানগরী ব্যসন-বিলাসের সু-রঙ্গভূমি। এখানে রাজপথ তাহার উভয় বাহুতে বহুল সুরম্য অট্টালিকা লইয়া শবরূপ মহাকালের ন্যায় নির্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে এবং সেই সকল রম্য

অট্টালিকার কক্ষে কক্ষে রসনা তৃপ্তিকর কত আচার-অনাচার-সম্ভূত আহার্য্য দ্রব্যের রাশি, কত রঙ্গ-বিরঙ্গের স্তূপীকৃত নয়ন মোহকর বস্ত্র ও বস্ত্রসঞ্জাত পরিধেয়, কত দেশী-বিলাতী পাদুকা, সোণার সংসার ধ্বংসকর এবং মানুষের ইহ-পরকালের সর্ব্বস্বনষ্টকর কত সুরা-বিপণি—আর কত ফুলমালা-সমাচ্ছাদিত ক্ষতের ন্যায় বস্ত্রালঙ্কার-শোভিতা পিশাচীর দল বিরাজ করিতেছে। তদ্ভিন্ন থিয়েটার আছে, ক্লাব আছে, সভা আছে; সমিতি আছে,—আর আছে প্রেমের নভেল। আমার স্বামী একে প্রথম হইতে উচ্ছৃঙ্খল, তাহাতে বঙ্গদেশবাসী, তদুপরি মহানগরীর বিলাসজাল-জড়িত, কাজেই খুব শীঘ্র শীঘ্র তাঁহার অধঃপতন-কার্য্য সম্পাদিত হইতে লাগিল।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—পাপকার্য্য করিবার সময় অর্থাগম অধিক পরিমাণে হয়। সত্য-মিথ্যা ভগবান্ জানেন। আমার মনে হয়, সে কথা সত্য হইতেও পারে;— কারণ সংসার কর্ম্ম-ভূমি—পরীক্ষাগার। এখানে যে যেদিকে চলিতে থাকে, তাহাকে সেই দিকে অতি দ্রুত চালাইয়া লয়;—বুঝি অর্থ মহা অনর্থকর পাপ-পথের পিচ্ছিল পদার্থ, তাই পাপপথগামী মানবের অর্থাগম অধিক হইয়া থাকে। শুনিতে পাই, এই সময় আমার স্বামীর অর্থাগম খুব হইত, কিন্তু তিনি যাহা উপার্জ্জন করিতেন, তাহা সঞ্চয় না করিয়া অসৎপথে—পাপকার্য্যে ব্যয় করিয়া ফেলিতেন; কেবল
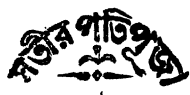
যাহা বেতন পাইতেন, তাহাই ঠিক মাসে মাসে আনিয়া আমার শ্বশুরকে প্রদান করিতেন। ইহাতে আমার শ্বশুর বুঝিতে পারিতেন না তাঁহার পুত্র অর্থবিনিময়ে অধঃপাতের চরমসীমায় গমন করিতেছেন। বিশেষতঃ শ্বশুর মহাশয় পরের কার্য্য করিতেন সর্ব্বদা সেই সকল কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিতেন, কাজেই তাঁহার পুত্র কোন সময় কোথায় কি কার্য্য করেন, তাহার সঠিক সংবাদ রাখিতে পারিতেন না। অধিকন্তু কূটবুদ্ধি-সম্পন্ন স্বামী আমার নিত্যই রাত্রি ১০ দশ ঘটিকার সময় বাসায় আসিতেন এবং নিত্যই প্রভাতে উঠিয়া কর্ম্মস্থলে গমন করিতেন; কাজেই আমার শ্বশুর মহাশয় বা বাসার কেহ জানিতে পারিতেন না যে, বৃক্ষ-কোটরে আগুন ধরিয়াছে—আমার স্বামীর চরিত্রে পাপ ঢুকিয়াছে। বৃক্ষ-কোটরস্থ অগ্নি যেমন ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাইয়া বৃক্ষের সর্ব্বস্ব নষ্ট করে, আমার স্বামীর এই পাপরাশিও তেমনি তাঁহার চরিত্রের বিশুদ্ধতা নষ্ট করিয়া দিল,— ক্রমে ক্রমে দেবতা দানব সাজিয়া বসিলেন।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

বিপদ-বারতা।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে অতিশয় গ্রীষ্ম পড়িলে মাড়োয়ারির কার্য্যের ছুটী ছিল, শরৎকালে শারদীয়া পূজাতেও ছুটী ছিল। ঐ দুই সময় স্বামী বাড়ী আসিতেন, —কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাইত, বাড়ী থাকা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর, বাড়ী আসিয়া তিনি ১৫।১৬ দিনের অধিক থাকিতেন না; থাকিবার জন্য অনুরোধ করিলে বলিতেন "আমার সেখানে অতিশয় প্রয়োজন, না গেলেই নয়; পরের চাকুরী করিতে হইলে বাড়ী থাকা চলে না।" আমার শাশুড়ীও তাহাই বিশ্বাস করিতেন, আমিও তাহাই ভাবিতাম। তবে তখনকার বয়স ও অবস্থানুসারে যদি এক আধ দিন থাকিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিতাম, তাহা তিনি কখনও রক্ষা করিতেন না, আমাকে কিছু বলিতেনও না; যে কয় দিন বাড়ী থাকিতেন, সর্ব্বদা আমার সহিত অসৎ-ব্যবহার করিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার প্রতি কখনও অসন্তুষ্ট হইতাম না। আমার স্বামী—আমার দেবতা, তিনি আমার উপর যেরূপ ব্যবহারই করুন, আমি তাঁহাকে চির দিন ভক্তি করিব,

পূজা করিব, ভালবাসিব ;—স্বামী স্ত্রীর গুরু বা ইষ্ট দেবতা, ইহা আমি বাল্যকাল হইতেই মনে-প্রাণে বুঝিয়া আসিতেছি।

আমি তাঁহাকে এত করিয়া আদর করিবার চেষ্টা করিতাম, তাহা সত্ত্বেও তিনি আমার প্রতি মুহূর্ত্ত কালের জন্যও করুণা করিতেন না, একটী মিষ্ট কথা বলিয়াও কখন তুষ্ট করিতেন না ; আমি যতই তাঁহার চরণে আত্মসমর্পণের চেষ্টা করিতাম,—তিনি ততই পায় জড়ান কণ্টক-শাখার ন্যায় আমাকে দূরে ফেলিয়া পলাইবার চেষ্টা করিতেন। মানবগণ যখন পাপের পথে অগ্রসর হয়, তখন তাহার ভালকে মন্দ বলিয়া এবং মন্দকে ভাল বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ; এই নিয়ম জগৎ ব্যাপিয়াই পরিদৃষ্ট হয়।

রমণীর স্বামী পরম দেবতা—মহাগুরু, স্বামী-সেবা স্ত্রীলোকের পরম ধর্ম্ম এবং স্বামীর গুণ কীর্ত্তন মহাস্তোত্রপাঠ। ইহা জানা সত্ত্বেও আমি যে স্বামি-নিন্দা করিতে বসিয়াছি এবং স্থানে স্থানে যে দুই একটী অপমানজনক বাক্য প্রয়োগ ও তুচ্ছতাচ্ছিল্যের কথা বলিতেছি বা বলিব ; সে কেবল প্রাণের আগুন নিবাইবার জন্য। পুত্রহারা অভাগী জননী জানেন, শত চীৎকার, শত আকুল আহ্বানেও তাঁহার মৃত পুত্র আর ফিরিয়া আসিবে না ; তথাপিও তিনি যেমন তাহাতে বিরত হইতে পারেন না, আমিও তদ্রূপ মনের আবেগে গুরু-নিন্দার মহাপাতক সঞ্চয় করিতেছি, ইহা

আনিয়াও ঐ কার্য্যে বিরত হইতে পারিতেছি না। মনের আশা,—আমার এই ক্ষীণ কণ্ঠের করুণ ক্রন্দন—কাতর কাহিনী শুনিয়া আমার মত কোন ভাগ্যহীনার স্বামী অধঃপতনের পথ হইতে যদি প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব।

পঞ্চম উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

প্রকৃতির দণ্ড।

আমাদের বিবাহের পর তিন চারি বৎসর এইরূপেই গত হইল। স্বামী আমার ব্যভিচারে লিপ্ত হইয়া এইরূপ ভাবেই তিন চারি বৎসর গত করিলেন। আমার শ্বশুর মহাশয় বা আত্মীয়-স্বজন কেহ তাহা বুঝিলেন না বা দেখিলেন না; যদিও কেহ কিছু দেখিয়া থাকেন বা বুঝিয়া থাকেন, তাহা সামান্য পরিমাণ এবং মার্জ্জনীয় বলিয়া উপেক্ষা করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যভিচারীর দণ্ড প্রকৃতি দিয়া থাকেন। প্রকৃতির হস্ত হইতে কোন ব্যভিচারী কখনও অব্যাহতি পায় নাই। আমার স্বামীও প্রাকৃতিক দণ্ডে দণ্ডিত হইলেন;—কলিকাতায় তাঁহার ভয়ানক জ্বর কাসি রোগ হইয়া পড়িল; তিনি দিন দিন শীর্ণ হইয়া পড়িতে লাগিলেন। এ অবস্থায় শ্বশুর মহাশয় তাঁহাকে বাড়ীতে না পাঠাইয়া, কলিকাতায় বাসায় রাখিয়া সেখানকার শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞতম ডাক্তার কবিরাজের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। প্রায় দুইমাস চিকিৎসার পর তাঁহার জ্বর বন্ধ হইল, কিন্তু কাসি গেল না। আরও কিছুদিন বহু যত্নে চিকিৎসা করাইলেন, কিন্তু রোগ উপশম হইল না;

তখন আমার শ্বশুর তাঁহার পুত্রকে লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিলেন।

ধূ ধূ প্রান্তরস্থিত পাথিক যেমন কালবৈশাখী মেঘের কোলে বজ্রাগ্নি দর্শন করিয়া চমকিয়া উঠে এবং ভীত হয়, আমার স্বামীর মূর্ত্তি দেখিয়া আমিও তদ্রূপ ভীত হইলাম। আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী এবং আর আর আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশিগণ পর্য্যন্ত সে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত, চমকিত হইলেন। শরীরে মাংসমাত্র ছিল না, কেবল চামড়ায় ঢাকা হাড় কয়খানি বিদ্যমান ছিল। সকলেই আমার শ্বশুরকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন,—এত বড় ভয়ঙ্কর রোগ হইয়াছে-এতদিন ভুগিতেছে, তথাপি আমাদিগকে একটু জানান হয় নাই। যাহা হউক, আমরা কায়মনোবাক্যে সকলে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলাম।

মনে হয়, মানব পাপকে প্রশ্রয় দিয়া তাহার সমস্ত হারাইয়া বসে;—যাহা হারাইয়া যায়, বহু যত্ন করিয়াও খুঁজিয়া আর তাহা মিলাইতে পারে না। মানব মাত্রেরই জ্ঞান আছে, যিনি সেই জ্ঞান মত কার্য্য করেন, জ্ঞানিগণের সৎচিন্তাপ্রসূত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করেন, জ্ঞানিগণের কার্য্যকলাপের অনুসরণ করিয়া কার্য্য করেন; এক কথায় যিনি জ্ঞান পাইব বলিয়া চেষ্টা করেন, তাঁহার জ্ঞানোন্নতি হয়। আর যিনি মানব-জীবনের জন্মলব্ধ জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞানীর মত কার্য্য করেন,—লোভ-মোহাদি রিপুর বশীভূত হইয়া যাহা,

করিতে নাই, তাঁহা করিতে থাকেন, কুসঙ্গীর সঙ্গ অসৎ গ্রন্থাদি পাঠ করেন, তাঁহারা ক্রমে ক্রমে অজ্ঞানকে পোষণ করিয়া জ্ঞানকে হারাইয়া ফেলেন ; তখন লোকে তাঁহাদিগকে জ্ঞানহারা বা অজ্ঞানী বলে। মানব আপন জ্ঞান আপনি হারাইলে, তাহা আর খুঁজিয়া পাইবে কোথায় ? কেহ বা জ্ঞানের উদ্দেশ্যে জ্ঞানকে খুঁজিয়া বেড়ায়, আবার কেহ বা অজ্ঞানের উদ্দেশ্যে অজ্ঞানকে খুঁজিয়া বেড়ায়। এ জগতে যে যাহা খোঁজে, সে তাহাই পায়। যে জ্ঞান খোঁজে সে জ্ঞান পায়, যে অজ্ঞান খোঁজে সে অজ্ঞান পায়। যিনি অজ্ঞানকে যত্ন করিয়া জ্ঞানকে হারান—তিনি জ্ঞানের অমূল্য রত্নরাজির সন্ধান আর পান না, অজ্ঞানের বিঘোর তামসী নিদ্রায় বুঝি চির মগ্ন হইয়া যান।

মানুষ যাহা চায়, তাহাই পায় ; ইহাতে ভগবানের দোষ নাই। যাহার দোষ সেই খুঁজিয়া লয়। যিনি যেরূপ কর্ম্ম করিবেন, তিনি সেইরূপ ফল ভোগ করিবেন। অজ্ঞানই অজ্ঞানীকে কুশিক্ষা দেয় ; ফলে তাহারা সেই পথে অগ্রসর হয় অজ্ঞানী কখনও সুখের মুখ দেখিতে পায় না এবং তাহার ফলে আজীবন নরক ভোগ ও দুঃখ ভোগ করিতে থাকে। দুই দিনের জন্য অমৃত ত্যাগ করিয়া মানুষ বিষকে বরণ করে এবং আজীবন সেই বিষের জ্বালা ভোগ করিতে থাকে। পতঙ্গ যেমন রূপের কুহকে মুগ্ধ হইয়া জলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিয়া মরণকে বরণ করে, মানুষ তেমনি পাপের কুহকে মুগ্ধ

নিজের সর্ব্বনাশ নিজে করে, তখন জ্ঞানের লেশ মাত্র থাকে না। আমার স্বামীও অজ্ঞানের পথে অগ্রসর, কাজেই এত প্রাণান্তকর শয্যাশায়ী মৃত্যুবিভীষিকাময় রোগগ্রস্তাবস্থায় জীর্ণ দীর্ণ কঙ্কালসার দেহে তবুও সেই পাপের আশা মনে মনে পোষণ করিতেছিলেন। মোহবশে মুগ্ধ হইয়া পাপ-পথের সহচর-সহচরীগণের এবং নিজের কুৎসিত আনন্দের ও কুক্রিয়ার কথা চিন্তা করিতেন। দিন দিন তাঁহার জীবনের আশা ফুরাইয়া আসিতেছিল, কিন্তু তাঁহার বিলাসের আশা—পাপের আশা—কুসঙ্গের আশা, বুঝি ক্রমে ক্রমে বর্দ্ধিত হইতেছিল। তাঁহার শরীরের অবস্থা দেখিয়া আমাদের বুক শুকাইয়া যাইত,—প্রাণ অস্থির থাকিত, কিন্তু তাঁহার ব্যবহার দেখিয়া অবাক্ হইয়া যাইতাম। তিনি সর্ব্বদা কলিকাতায় যাইবার জন্য চেষ্টা করিতেন। বাড়ীর কাহারও সহিত সদয় ব্যবহার করিতেন না; বিশেষতঃ আমাকে দুই চক্ষুর বিষ দেখিতেন; আমি কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে অগ্রসর হইতাম, আর তিনি আমাকে শিয়াল-কুকুরের মত দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিতেন। আমি কত বিনিদ্র রজনী তাঁহার রুগ্ন-শয্যার অদূরে বসিয়া কাঁদিয়াছি—চোখের জলে মাটী ভিজাইয়াছি; তবু তিনি কটূক্তি করিতে বিরত হন নাই। যাহা হউক, আমি তাঁহার সমস্ত অত্যাচার, অবিচার ও কটূক্তি সহ্য করিয়া তাঁহার সেবা করিতাম। কারণ তিনি আমার দেবতা এবং তিনি বাঁচিয়া থাকিলেই আমার

জীবনের সকল সুখ বজায় থাকিবে। কিন্তু আমার স্বামী যে, কলিকাতায় বিলাস-সাগরে গা ভাসাইয়াছেন—কুহকী বেশ্যার পাপ বাহুবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছেন, কুসঙ্গীর সঙ্গ দোষে আরও কত পাপাচারে লিপ্ত হইয়াছেন, তাহা তখন জানিতে পারি নাই। তবে মনে হইত, যেন কি হইয়াছে, যেন কুসুম-উদ্যানে কণ্টকরাশি উৎপাদিত হইয়াছে। যেন যেখানে সাজান বাগান ছিল, সেখানে আগুন জ্বলিয়াছে। যাহা হউক, আমার স্বামীর অত্যন্ত জিদে আমার শ্বশুর তাঁহাকে লইয়া পুনরায় কলিকাতায় গমন করিলেন। আমি অভাগিনী সেই মৃতবৎ স্বামীর অদর্শনে যে কি কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলাম, তাহা অন্তর্যামী শ্রীভগবানই জানিতেন, আর জানিতেন আমার শাশুড়ী মাতা,—বুঝি আমার মলিন বিষণ্ণ চিন্তা-ক্লিষ্ট মুখ আর উদাস হতশ্রী নয়নই তাঁহাকে সে বারতা জানাইয়া দিত।

ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস।

—•:•:•—

কটূক্তি ও কর্ত্তব্য।

মানুষ যখন ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া পড়ে, তখন তাহার সমস্ত হিতাহিত জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া যায়; জীবনের আশা পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রিয় তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা চেষ্টা পাইয়া থাকে। আমার স্বামীও তখন ইন্দ্রিয়াধীন হইয়া পড়িয়াছিলেন,—তিনিও তখন—তাঁহার জীবন-তরণীর ডুবুডুবু কালে পাপের আয়োজন ও চেষ্টায় নিরত থাকিতেন। আমার শ্বশুর মহাশয় এই সময় পুনরপি তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া গিয়া, চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল না,—তাহাতে পুত্রস্নেহ, পুত্রের জীবন-প্রদীপ নিবুনিবু,—কাজেই তিনি জলের মত অর্থব্যয় করিয়া কলিকাতার শ্রেষ্ঠ ও বিজ্ঞ চিকিৎসকগণের দ্বারা চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তাহাতে আমার স্বামীর শরীর সামান্য একটু সুস্থ হইয়া উঠিতেছিল; তিনি ঐ অবস্থাতেই একটু একটু কাজকর্ম্মও দেখিতেন। কিন্তু নিদানবর্জ্জিত না হওয়ায় রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইল না, তবে শ্বশুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে লিখিয়া জানাইতেন যে, রোগ আরোগ্যের পথে

যাইতেছে, তোমাদের ভয় নাই। আমি সে সংবাদ শুনিয়া মনে মনে সুখী হইতাম এবং শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দিতাম। গোপনে অশ্রুসিক্ত নয়নের উদাস-কাতর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধদিকে চাহিয়া কৃতাঞ্জলি-পুটে শ্রীভগবানের কৃপাপ্রার্থিনী হইয়া বলিতাম,—দয়াল প্রভু! আমার শাঁখা-সিন্দূর বজায় রাখিও। তোমা বই এ বিপদ্-সাগরে অন্য ভরসা কিছুই নাই।

বৈশাখ মাস;—পল্লী-প্রকৃতি নব সাজে সাজিয়া বসিয়াছেন। বৃক্ষলতা ফল-ফুলে অবনত, শাখায় শাখায় পক্ষি-কলরব এবং আকাশে নবীন মেঘের নব উদয়। এই সময় একদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমার স্বামী আসিয়া বাড়ীতে দর্শন দিলেন। তাঁহার শারীরিক অবস্থা সামান্য একটু মাত্র ভাল দেখিলাম। খরস্রোতে ভাসমান পিপীলিকা, স্রোতে ভাসমান একগাছি ক্ষুদ্রতৃণের আশ্রয় পাইলে যেমন একটু আশান্বিত হয়, আমরাও তেমনি আশান্বিত হইলাম—কিন্তু পিপীলিকা তৃণাশ্রয় গ্রহণ করিয়াও কি করিয়া কূল পাইবে, সে ভাবনা পরিত্যাগ করিতে পারে না, বরং অস্থির হইয়া উঠে, আমাদেরও তাহাই হইয়াছিল। কিসে স্বামী আমার সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া সম্পূর্ণ শক্তি ও শ্রীমান্ হইতে পারেন, সেই ভাবনা হৃদয় জুড়িয়া বসিত। যাহা হউক, তিনি কলিকাতা হইতে ঔষধাদি সঙ্গে আনিয়াছিলেন, তাহাই সেবন করিতে লাগিলেন. এইরূপে কয়েক দিন কাটিয়া গেল

এই সময় একদিন আমাদের দেশস্থ একটি লোক আসিয়া তাঁহার শারীরিক অবস্থা দেখিয়া বলিয়া দিলেন,—তুলসী বৃক্ষের তিনটি করিয়া শীর্ষপত্র উহাকে কয়েকদিন সেবন করাইবেন, তাহাতেই রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া যাইবে! কিন্তু সে কার্য্য কে করিবে! তুলসী-পত্র বিষ্ণু-পূজা ব্যতীত অন্য কারণে চয়ন করিলে মহাপাতক হয়;—তাহাতে বৃক্ষের শীর্ষচ্ছেদন করিতে কেহই স্বীকৃত হইল না। কিন্তু আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। যদি তিনি ইহাতে আরোগ্য হন,—যদি তাঁহার স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য্য ফিরিয়া আসে,—যদি তাঁহার রোগ-ক্লিষ্ট দেহে স্ফূর্ত্তি দেখা যায়,—যদি তাঁহার ব্যাধি-বিষণ্ণ-অধরে হাসির রেখা বিকশিত হয়, তবে এ কার্য্য আমারি করিতে দোষ কি? আমার স্বামী—আমার দেবতা—আমার শ্রীকৃষ্ণ—তাঁহার জন্য তুলসী চয়ন, আমি করিব বৈ কি! তবে শীর্ষচ্ছেদন, তাহাতেই বা দোষ কি? তস্মিন্ তুষ্টে জগৎ তুষ্টি—তাঁহার তুষ্টিতে সারা জগতের তুষ্টি। তবে বৃক্ষাধিষ্ঠাত্রী শ্রীমতী বৃন্দাদেবী কেন আমাকে অভিশপ্ত করিবেন? আমি নিত্য নিত্য তুলসী কানন-মধ্যে গমন করিয়া করযোড়ে প্রার্থনা করিতাম—ক্ষমাভিক্ষা করিতাম—আমার স্বামী দেবতার জন্য—আমার নারায়ণের জন্য তোমাকে তুলিয়া লইতেছি, তুমি রাগ করিও না,—তুমি তাহার স্বাস্থ্য ও শান্তি আনায়ন কর।
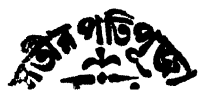
এইরূপে নিত্য তুলসীদল সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সেবন করাইতাম, কলিকাতা হইতে আনীত ঔষধ সেবন করিতেন,—কিন্তু রোগের উপশম হইত না। অধিকন্তু সর্ব্বদাই তিনি বিরক্ত ও ক্রোধন স্বভাবে পরিপূর্ণ থাকিতেন; বিশেষতঃ আমার উপরেই তাঁহার জাতক্রোধ যেন সর্ব্বদা লাগিয়াই থাকিত। আমি কায়মনোবাক্যে যতই তাঁহার সেবা ও সন্তোষ বিধানের চেষ্টা করিতাম, তিনি যেন ততই আমাকে গৃহপালিতা অথচ উপেক্ষিতা বিড়ালীর মত নিকট হইতে দূরে তাড়াইয়া দিবার চেষ্টা করিতেন। আমাকে গালাগালি দিলে যেন তাঁহার আনন্দ হইত, আমি অভাগিনী মনে করিতাম,—যদি আমাকে গালাগালি দিয়া, আমার স্বামী দেবতার মনে শান্তি হয়, তাহাই হউক। কিন্তু সকল সময় সেই তীব্র কটূক্তি সহ্য করিতে পারিতাম না,—নীরবে লুকাইয়া লুকাইয়া কাঁদিতাম। আবার নিজেই, নিজের মনকে প্রবোধ দিতাম যে, হয়ত মানুষ ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া এইরূপ স্বভাবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

তাঁহার কাসি ক্রমেই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল,—বিশেষতঃ রাত্রিকালে সে কাসি অধিকতর দুর্দ্দমনীয় প্রবলাকার ধারণ করিত। নীরব নিশীথ কালে যখন নির্জ্জন-গৃহে স্নিগ্ধ আলোক-তলে শয্যার উপর সেই রোগজীর্ণ-বিশীর্ণ-দেহে শায়িত থাকিয়া কাসিতে কাসিতে তাঁহার মূর্চ্ছা হইবার উপক্রম হইত, তখন

আমি একাকিনী তাঁহার শিয়রে বসিয়া যে কি মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা অনুভব করিতাম, তাহা সেই অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান্ ব্যতীত আর কেহই বুঝিতেন না। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ধারাকারে চক্ষুর জল পড়িয়া বুক ভাসিয়া যাইত, মনে হইত ;—এ কাল ব্যাধি কেন আমার হইল না! আমি যন্ত্রণা পাইলে—আমি মরিলে এ জগতে বুঝি ব্যথা পাইবার আর কেহই নাই। কিন্তু আমার স্বামীর এ কষ্ট, আমি কি করিয়া দেখিতে পারি।

পুরাতন রোগ, নিত্য রাত্রি জাগরণ অপরে কেহ বড় করিতে সুবিধা জ্ঞান করিত না। আমি তাঁহার শিয়রে বসিয়া নিশি জাগিয়া কাল কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু আমার স্বামী—এ অবস্থাতেও আমাকে কোনদিন একটু মিষ্ট কথা বল্লেন নাই ; অধিকন্তু সামান্য খুটিনাটিতে আমাকে গালাগালি দিয়া ব্যথিত করিতেন। কোন কোন দিন ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য আদেশ করিতেন, আমি যাইতাম না বলিয়া কত কটূক্তি-কত ভৎর্সনা—কত তীব্র ভাবভঙ্গি প্রদর্শন করিতেন। কিন্তু আমি তাঁহাকে কাহার নিকট রাখিয়া যাইব,—কে সারা নিশি জাগিয়া তাঁহার শুশ্রূষা করিবে? আর যদি কেহই বা তাহা করে, তাহা হইলেই বা আমি যাইব কেন, আমার মানবজন্মের কর্ত্তব্য কর্ম্ম,—রমণী-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ব্রত স্বামী-সেবার বিঘ্ন উৎপাদন-

কারী এই দুর্ব্বাক্যগুলি যদি সহ্য করিতে না পারিলাম, তবে হিন্দুর মেয়ে হইয়া জন্মিলাম কেন। হিন্দুর মেয়ে জানে, জীবন-মরণে—স্বপনে, জাগরণে আদরে-অনাদরে—স্বামী-সেবায়ই এক-মাত্র ধর্ম্ম।

সপ্তম উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

দৈববাণী।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আমার স্বামীর রোগও পুরাতন হইয়া উঠিল। তখন চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারিতেন, কিন্তু কাসি ছিল, কাজ কর্ম্ম করিতে পারিতেন না। জীর্ণ ও পুরাতন রোগীর অবস্থা যেমন হয়, তাঁহারও তেমনি হইয়াছিল। কিন্তু আমার উপর রাগ; আমার উপর দুর্ব্ব্যবহার না কমিয়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিসে যে অমন হইত, কিছুতেই তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তাঁহার মনস্তুষ্টির জন্য যে পন্থাই অবলম্বন করিতাম,—যে কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিতাম,—যে কথাই বলিতাম,—তাহাতেই যেন তাঁহার হৃদয় জ্বলিয়া যাইত। কোথা হইতে রাগের ফোয়ারা ফুটিয়া বাহির হইত। যদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া ভাল কাপড় চোপড় পরিয়া তাঁহার সম্মুখে যাইতাম, তাহা হইলে নানাবিধ অশ্রাব্য কথা বলিয়া এবং ঐরূপ করাই নানাবিধ দোষ বলিয়া কটূক্তি করিতেন। আবার যদি ময়লা কাপড়ে অপরিচ্ছন্নভাবে নিকটস্থ হইতাম, তাহা হইলেও ঘৃণ্য বলিয়া দূর
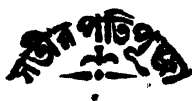
করিতে চেষ্টা করিতেন। হাসিলে ভর্ৎসনা করিতেন, মুখ ভার করিয়া থাকিলেও বিদ্রূপবাক্যে ব্যথিত করিতেন।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার স্বামী আদর যত্ন করে, তাহার বাড়ী শুদ্ধই তাহাকে আদরে, সোহাগে লালন পালন করিয়া থাকে। আর যে হতভাগিনীকে স্বামী দেখিতে পারে না, তাহাকে কেহই দেখিতে পারে না; বাড়ীর দাস দাসী পর্য্যন্ত তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া থাকে। এমন কি প্রতিবাসিগণ পর্য্যন্ত তাহাকে দশ কথা শুনাইয়া দিতে কৃপণতা করেন না। তাহার দৈহিক সৌন্দর্য্য, নৈতিক কর্ম্ম সমূহ, ধর্ম্মাধর্ম্মের আচরণ ও সাংসারিক সুসম্পাদিত-কাজ কর্ম্ম ও সকলের নিকট নিন্দনীয় হইয়া পড়ে। সে যেন সকলের নিকট শত অপরাধে অপরাধী—সে যেন বিশ্বের সমগ্র পাপতাপ সংগ্রহ করিয়া সকলকে জ্বালাইবার জন্য বসিয়া থাকে,—সে যেন সকলের অনিষ্ট করিবার জন্য দিন রাত্রি ব্যগ্র হইয়া ছুটাছুটি করে! তাই সকলে তাহাকে দেখিতে পারে না; তাই সে সকলের দ্বারা নিগৃহীতা হয়। কিন্তু হায়! স্বামি-বিরাগের বিপুল বহ্নি বুকে করিয়া অভাগিনী যে কি কষ্টে দিন কাটায় তাহা কেহই একবার বুঝিয়া দেখে না। আমার অদৃষ্টেও এই ঘটনা ঘটিয়া উঠিয়াছিল। আমার স্বামী দেখিতে পারিতেন না—কটূক্তি করিতেন, কাজেই আমার শ্বশুর শাশুরী এবং বাড়ীশুদ্ধ সকলেই ঐরূপ করিতেন। এক দিনের একটি ঘটনা মাত্র এস্থলে উল্লেখ

করিতেছি—গ্রীষ্মকালে একদিন আমি পড়িবার জন্য এক জোড়া মোটা কাপড় পাইয়াছিলাম। স্বামিনিগৃহীতা আমি—শ্বশুরশাশুড়ীর চক্ষুর শূল আমি, তখনকার অবস্থা জ্ঞানহীনা আমি—বালিকাসুলভ চপল বুদ্ধিতে কেবল বলিয়াছিলাম—গ্রীষ্মকালে এত মোটা কাপড় পরা যায় না ইহা থাক, শীতকালে পড়িব। এই সামান্য অপরাধেই, অথবা ধরিতে গেলে বিনা অপরাধেই কত অকথ্য কথনে স্বামী আমাকে গালাগালি দিলেন। বলিতে এখনও বুকে বেদনা লাগে, এই অপরাধে কেবল গালাগালি দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই—কেবল কটূক্তি করিয়াই শান্তি পান নাই—কেবল তাড়নাতেই বুঝি তাঁহার বুকের বোঝা নামে নাই, তাই আমাকে প্রহার করিলেন এবং তাঁহার বাড়ী হইতে দূর করিয়া দিবেন, বলিয়া দিলেন—তোমার যেখানে ইচ্ছা চলিয়া যাও।

আমার শ্বশুরবাড়ী হইতে পাঁচখানি বাড়ীর পরই আমার বাপের বাড়ী। আমি নীরবে চক্ষুর জলে পল্লীপথ সিক্ত করিতে করিতে বাপের বাড়ী চলিয়া গেলাম। সেখানে গিয়া কাহাকেও কিছু না বলিয়া একস্থানে বসিয়া পড়িলাম এবং আপন অদৃষ্ট চিন্তা করিতে লাগিলাম। কান্না ত তখন আমার সাথের সাথী, আমাকে তদবস্থায় দর্শন করিয়া আমার মাতা ও মাতামহী নিকটে আসিয়া তদবস্থায় বসিয়া থাকা ও কাঁদিবার কারণ কি পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন; কিন্তু আমি কোনই উত্তর করিতে পারিলাম
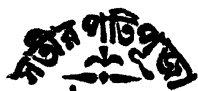
না। চেষ্টা করিয়াছিলাম, কিন্তু কথা সরিল না ;—দুঃখে, ক্ষোভে, ঘৃণায়, লজ্জায়, বুক ফাটিয়া যাইতেছিল। প্রবাহমান চক্ষুর জল আরও প্রবল হইল—অভিমান-ক্ষুণ্ণ হৃদয় আরও বেগ ধারণ করিয়া উঠিয়াছিল।

এই সময় আমার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন,—বোধ হয় আমার শাশুড়ীর নিকট আমার বাপের বাড়ী আসার সংবাদ পাইয়াই; তিনি তথায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহার মূর্ত্তি তখন বড় ভয়ঙ্কর,—ব্যাধিবিশীর্ণ কঙ্কালসার দেহ ক্রোধে কাঁপিতেছিল, চক্ষুদ্বয় উর্দ্ধ উত্থিত ও রক্তবর্ণ, আসিয়া আমার মা বা মাতামহীকে কোন কথা না বলিয়া আমাকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। আমি তাঁহার এই অপমানজনক, আকর্ষণ হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য সামান্য মাত্র বলও প্রকাশ করি নাই। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহাদের বাড়ী আসিলাম। কিন্তু বাড়ী আসিয়া তিনি আরও সহস্র প্রকার অকথ্য কথনে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। বাড়ীর সকলেও সে সঙ্গে যোগ দিয়া আমাকে কটূক্তি করিতে ত্রুটি করিলেন না। দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে, আমার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল ; আমি সে সকল কথার কোন প্রকার উত্তর না করিয়া, কেবল মাত্র চক্ষুর জল সম্বল করিয়া, আমার নির্দ্দিষ্ট শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলাম। ভিতর হইতে গৃহের দরজা সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিয়া দিয়া মেজেই পড়িয়া লুটিয়া

লুটিয়া কাঁদিতে লাগিলাম। আমার এই দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্য শ্রীভগবানের চরণোদ্দেশে কত অশ্রুজল ফেলিলাম,—কাতর-স্বরে কত কথা বলিলাম, তারপরে নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—ব্যথিতের অবলম্বন—শান্তিহীনের শান্তিপ্রদাতা,—যমকে ডাকিয়া বলিলাম, হে যম! তুমি আমাকে নাও। যে রমণী স্বামীর দুই চক্ষের শূল,—যে রমণী শ্বশুর-শাশুড়ীর স্নেহ-করুণায় বঞ্চিত, যে রমণী আত্মীয় স্বজন দ্বারা নিগৃহীত, তাহার তুমি ভিন্ন আর কোন গতি নাই, মৃত্যুই তাহার শান্তি। তারপরে মনে হইল, পরমায়ু থাকিতে যম বুঝি কাহারও নিকটে আসেন না,—ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া নিজে তাঁহার বাড়ী যাইতে হয়, আমিও তাহাই করিব, আত্মহত্যা করিব। একবিন্দু ঔষধে বা একখানি ক্ষুদ্র ছুরিকা দ্বারা সকল জ্বালা জুড়াইতে পারিব।

হঠাৎ মনে হইল আত্মহত্যা যে মহাপাপ! গত জন্মে কত মহাপাপ করিয়াছি, এজন্মে তাহারই ফল ভোগ করিতেছি! আবার আত্মহত্যারূপ মহাপাতক করিয়া, দুঃখ, কষ্ট ও অশান্তির বোঝা মাথায় লইয়া যাত্রা করিব? জীবন কয় দিনের জন্য? এই কয়টা দিন কোন প্রকারে দুঃখ কষ্টের অগ্নিদাহ সহ্য করিব।

এইরূপ নানাপ্রকার ভাবিতে ভাবিতে একটু যেন তন্দ্রা আসিয়াছিল, হঠাৎ যেন কাহার কলকণ্ঠের মধুর স্বর আমার কর্ণে প্রবেশ করিল। কে যেন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—ভয় কি; স্থির

হও, শান্তি পাইবে। নিদাঘ-তপ্ত ধরণীবক্ষে বর্ষার বারিপাত শীতলতা আনিয়া দেয়, দেখিয়াছ ত? শীতের দারুণ কুহেলিকাচ্ছন্ন বিষণ্ণ প্রকৃতির মুখে বসন্তের মধুর সমীর হাসি ফুটাইয়া দেয়, দেখিয়াছ ত? তবে তুমি মরিবে কেন! আঁধারের পর আলোক উঠে, মরণের পর জীবন ফুটে, কান্নার পর হাসি দেখা যায়, রোগের পর আরোগ্য উপস্থিত হয়। তোমার এ দুঃখকষ্টের অবসান না হইবে কেন?

আমার তন্দ্রা ভাঙ্গিয়া গেল। চারিদিকে চাহিয়া রহিলাম, সেই রুদ্ধ গৃহে আর কেহ নাই,—কোথাও একটু শব্দও নাই,—কেবল গৃহে রক্ষিত ঘড়িটি অনবরত টিক্ টিক্ করিয়া তাহার মর্ম্ম-বেদনা কাহাকে অবগত করাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিতেছে। আমার মনে হইল, এমন মধুমাখা স্বরে, এমন সান্ত্বনাবাক্য এ হত-ভাগিনীকে কে শুনাইয়া দিল! তবে কি দয়াল প্রভু আমার করুণ ক্রন্দনে,—আমার বিদীর্ণ বক্ষের আকুল প্রার্থনায় করুণা করিয়া একথা বলিয়া দিলেন।

আবার মনে হইল—যদি শ্রীভগবানই করুণা করিবেন, তবে আমাকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন কেন? তিনি ইচ্ছাময় তাঁহার ইচ্ছাতে জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হইয়া থাকে,—আমরা ত কোন্ অণু হইতে অণু! তাঁহার ইচ্ছামাত্রই আমার স্বামীর সুমতি হইতে পারে, তিনি দুষ্কর্ম্ম-নরকের গভীর গুহা হইতে উত্থিত

হইতে পারেন, ব্যাধি-রাক্ষসের করাল কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন,—এ অনাদৃতা, সন্তাপিতা পদদলিতা, নির্জ্জিতা, উপেক্ষিতা অভাগিনী দাসীকে আমার বলিয়া গ্রহণ করিয়া, পরম সুখী করিতে পারেন।

মানুষ আপন কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে, ভগবান্ বা অপর কেহই সুখ-দুঃখের প্রদাতা নহেন; কর্ম্মফলই সুখ-দুঃখ দিয়া থাকে। আমি জন্ম-জন্মান্তরে যেমন কর্ম্ম করিয়াছি, তেমনি ফল ভোগ করিতেছি ও করিব। তবে কি ভগবানের কৃপা-করুণায় মানুষ বিপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারে না! তবে তাঁহার নাম বিপদ্বারণ কেন? শুনিয়াছি, মানুষ যখন অপর সকল সাহার্য্য পরিত্যাগ করিয়া, অপর সমস্ত আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া, কেবল তাঁহাতেই আত্মনির্ভর করে, তখন তিনি সেই দুঃখীকে—সেই আর্ত্তকে, সেই বিপন্নকে ত্রাণ করিয়া থাকেন। আমার সেইরূপ নির্ভরতা কোথায়? তবে প্রাগুক্ত প্রবোধ বাক্য-গুলি কে আমাকে শুনাইল? কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। বুঝি সেই দুঃখ, ক্ষোভ—অভিমানরাশির মধ্যে সেই তাড়না-জর্জ্জরিত বিষাদ-বিষম অবস্থার মধ্যে বিচার বিতর্কের স্থান কোথায়? আমার জ্ঞান হইতেছিল, জগৎ যেন দুঃখের আগুন জ্বালিয়া বসিয়া, আমাকে পোড়াইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। আমি তদবস্থাতেই সেই গৃহের মধ্যে মেজের উপর পড়িয়া

রহিলাম। দরজাও সেইরূপ অবরুদ্ধ রহিল। যখন সারাদিনের পরও আমাকে কেহ বাহিরে দেখিতে পাইল না, তখন কৌশলে দরজা খুলিয়া গৃহ হইতে আমাকে টানিয়া বাহির করিয়া আনিল। দশ ও বার কলসী জল আমার মাথায় ঢালিয়া দিয়া, স্নান করাইয়া আহারের জন্ম অনুরোধ করিল। শোকে, দুঃখে, হৃত সম্পত্তিতে মানুষ যতই অবসন্ন, বা মুহ্যমান হউক আহার ত্যাগ করা চলে না। আমিও ত্যাগ করিতে পারিলাম না। বাঁচিতে হইলেই খাইতে হয়,—আমিও সামান্ত কিছু খাইলাম।

অষ্টম উচ্ছ্বাস।

—•:*:•—

অবস্থা বা ভাব।

ইহা একদিনের ঘটনা। এইরূপ নিত্য ঘটনার দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়া হতভাগিনীর দিন কাটিতে লাগিল। সে বাড়ীর মধ্যে অভাগিনীর মুখ চাহিবার কেহ ছিল না। বেদনা বুঝিবার শক্তি কাহারও হইত না, কেবল ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, তাড়না, ভর্ৎসনা। আমি কাজ করিলে কাহারও মনঃপূত হইত না, রাঁধিলে কাহারও ভাল লাগিত না, বুঝি সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেলেও, ক্রোধে বাড়ীর সকলেই জ্বলিয়া যাইত। বিশেষতঃ আমার স্বামী সমস্ত কার্য্যের সমস্ত খুটিনাটি লইয়া আমাকে সমস্ত দিনরাত্রি জ্বালাইয়া পোড়াইয়া খাক করিয়া তুলিতেন।

আর একদিন ঐরূপ তাড়নার—ভৎসনার অসীম যন্ত্রণা অসহ্য জ্ঞান করিয়া, আমি আমার মামার বাড়ী পলাইয়া গিয়াছিলাম। আমি রন্ধনাদি সমাপ্ত করিয়া, সকলকে খাওয়াইয়া, নিজে অভুক্ত অবস্থায় চলিয়া গিয়াছিলাম। সেখানে গিয়া তাঁহাদের একখানি ঘরের মধ্যে লুকাইয়াছিলাম। ভয়, পাছে আমার স্বামী সেখানে গিয়া আমাকে প্রহার করেন। আমার শ্বশুরবাড়ীর লোক

অনেক স্থানে খুঁজিয়া বেড়াইলেন, কিন্তু কোথাও মিলাইতে পারেন নাই। অবশেষে সন্ধ্যার পরে আমার মামার বাড়ীর একজন লোক তাঁহাদিগকে সংবাদ দিয়া যায়—যে সে, আমাদের বাড়ী আছে, আহারাদির পর রাখিয়া যাইব। হইলও তাহাই; আহারাদি করাইয়া শ্বশুরবাড়ী রাখিয়া আসিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপরে যে যন্ত্রণা পাইয়াছিলাম—তাহা আর বলিতে পারিব না। মনে করিলে এখনও বুক ফাটিয়া যায়। এইরূপ নিত্য নিত্য দুঃখ কষ্টের ঘটনারাশির মধ্য দিয়া অভাগিনীর দৈনন্দিন জীবনের কার্য্যপ্রবাহ চালতি হইতে লাগিল।

শ্রীধাম নবদ্বীপে আমার শ্বশুরের একখানি বাড়ী ছিল, এবং তথায় আমার শশুরের মাসীমাতা ঠাকুরাণী বাস করিতেন।

আমার স্বামীর বুঝি হৃদয়ে ধারণা হইয়াছিল—গ্রামে আমার পিত্রালয়, আমি পিত্রালয় হইতে মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণের নিকটে কুশিক্ষা পাইয়া আসিয়া, তাঁহাদিগকে অত্যাচারের আগুনে দগ্ধ করিতে বসিয়া থাকি। কিন্তু হায়! তিনি বুঝিতেন না যে তাঁহার হৃদয় পাপকালিমায় প্রলিপ্ত হইয়া গিয়াছে! পূতিগন্ধময় ক্ষতস্থানে পূত চন্দনরাশির প্রলেপ দিলে, তাহা যেমন জ্বালাকর ও দুর্গন্ধ বলিয়া জ্ঞান হয়, তেমনি আমার কার্য্যও তাঁহার নিকট জ্ঞান হইতেছিল। কুহকিনী বারাঙ্গনাগণের পাপ বাহুর বিকট বন্ধন যাঁহার নিকট সুখকর, তাঁহার নিকট কুলাঙ্গনার লজ্জা, সঙ্কোচ-

হস্তের গোপন পূজা বিরক্তিকর না হইবে কেন! যাহা হউক, ঐ ভ্রান্তধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তিনি মনে করিলেন, এ গ্রাম হইতে অন্যত্র লইয়া যাইতে পারিলে, আমি তাঁহার মনের মত হইতে পারিব। তাই তিনি একদিন আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—তোমাকে নবদ্বীপের বাড়ীতে লইয়া যাইব। আমি স্বীকৃত হইলাম, কেন না হইব? স্ত্রী স্বামীর ছায়ার ন্যায়—স্বামী যেখানে যাইবেন, স্ত্রীও সেখানে যাইবে; সেখানে গিয়া অত্যাচার করেন, মাথা পাতিয়া সহিয়া লইব, অত্যাচার সহ্য করা আমার পক্ষে ত নূতন নহে।

ইহার কয়েকদিন পরে তিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া নবদ্বীপে গমন করিলেন এবং আমার শ্বশুরের মাসীমাতার নিকটে রাখিয়া তৎপর দিবসেই কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। তিনি আমার সম্বন্ধে দিদিমাতাকে কি বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা আমি জানি না, তবে আমাকে এই বলিয়া গেলেন, যে তোমাকে এখানে পাঁচ বৎসর থাকিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, তুমি আবার কবে আসিবে? তিনি সে কথার কোনই উত্তর দেন নাই। তখন গ্রীষ্মকাল,—তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত একটু ভাল ছিল,—কাসরোগ শীতকালের চেয়ে গ্রীষ্মকালে স্বভাবতঃই একটু উপশম থাকে।

দেশের চেয়ে নবদ্বীপে আসিয়া আমি ভালই ছিলাম। দিদি-মা

আমার উপর কোন অত্যাচার অবিচার করিতেন না। তাঁহার সহিত নিত্য নিত্য গঙ্গা স্নান করিতাম,—নিত্য নিত্য মন্দিরে মন্দিরে নানাবিধ দেববিগ্রহ দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতাম এবং নিত্য নিত্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেবের ষড়ভুজ মূর্ত্তি দর্শন করিতাম, আর দেবতার দুয়ারে দুয়ারে মাথা কুটিয়া প্রার্থনা করিতাম,—যে স্বামী আমাকে এত সুখের মধ্যে, এত আনন্দের নিকেতনে, এত পুণ্যের মধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার যেন পাপলালসা হৃদয় হইতে বিদূরিত হয় এবং স্বাস্থ্য ও চরিত্র ফিরিয়া আসে। কিন্তু অভাগিনীর অদৃষ্টে তেমন আনন্দ—তেমন সুখ—তেমন শান্তি অধিক দিন রহিল না। দুই মাস গত হইতে না হইতেই আমার স্বামী আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং আমাকে বলিলেন দুই চারি দিবসের মধ্যে দেশে যাইতে হইবে।

ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু তাঁহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহসে কুলাইত না। তথাপি সঙ্কুচিত অন্তঃকরণে কম্পিত কণ্ঠের বিনম্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কলিকাতায় যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন, পাঁচ বৎসর পরে আমাকে দেশে লইয়া যাইবেন। কিন্তু দুই মাস পরেই লইয়া যাইতে চাহিতেছেন কেন? আপনি বলিয়াছিলেন নবদ্বীপে লইয়া গিয়া তোমাকে যথেষ্ট কষ্ট দিব।

কিন্তু কৈ কোন কষ্টত দেন নাই? বরং আমি সুখেই দিন

কাটাইতেছি। নিত্যই বহুল বেদ-বিগ্রহের শ্রীমূর্ত্তির দর্শন করিয়া পুলকানন্দ অনুভব করিতেছি। তবে কি আমার দুঃখ কষ্টের শেষ হইয়া গেল? কিন্তু কৈ; আপনার শরীরত এখনও সারে নাই? আপনার শরীর না সারিলে,—আপনি ব্যাধি-বিমুক্ত না হইলে, আমি কিছুতেই সুখী হইতে পারিব না। আমার এত কথার, তিনি কোন উত্তরই করিলেন না। কেবলমাত্র বলিলেন,—"আমি যাহা ভাল বুঝিব, তাহাই করিব;—আমার ইচ্ছানুযায়ী তোমাকে চলিতে হইবে,—বিশেষ দরকার, তাই দেশে লইয়া যাইব।" স্বামীর কথায় কোন রমণী অসম্মত হয়? স্বামীর ইচ্ছামত কে না কার্য্য করে? আমি যাইতে স্বীকৃত হইলাম।

ইহার পর দিবসই আমাকে লইয়া আমার স্বামী দেশাভিমুখে রওনা হইলেন. এবং বাড়ী পঁহুছিয়া—দুইদিন মাত্র বাড়ী অবস্থান করিয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। কেন আসিলেন, কেন গেলেন এবং কেনই বা আমাকে তত শীঘ্র নবদ্বীপ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন, ইহা আমিও বুঝিতে পারিলাম না, অপর কেহ বুঝিল কি না—জানিল কি না, আমি তাহাও জ্ঞাত হইতে পারিলাম না। তাঁহার আকৃতি-প্রকৃতি, হাব-ভাব, চাল-চলন সবই যেন ঔদাস্যময়। সমুদার প্রকৃতি থাকিলে মানুষে যেমন গাম্ভীর্য্য থাকে, তাহাতে তাহা আদৌ ছিল না; যেন কি হারাইয়া গিয়াছে, যেন কি মহান্ ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, যেন কি বিভীষিকার অগ্নি-

দহনে তাঁহার সম্মুখস্থ শান্তির বাগান পুড়িয়া খাক হইতেছে,— তাই তিনি সর্ব্বদাই ব্যস্ত ও বিচলিত। আমার প্রতি তাঁহার অমানুষিক অত্যাচারে আমি যত দুঃখিত ও মর্ম্মাহত ছিলাম,— তাঁহার শারীরিক অমানুষিক অবস্থা জানিয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণ মর্ম্ম-যাতনা অনুভব করিতাম এবং সর্ব্বদা ভগবানের কাছে স্বামি-দেবতার মঙ্গল কামনা করিতাম।

তিনি কলিকাতায় গিয়া পুনরপি অসৎ-সঙ্গ ও অসৎ-কার্য্যে মিশিয়া পড়িলেন। ইহাতে অল্প দিনেই তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়া বসিল। আবার শয্যাশায়ী হইলেন। শ্বশুর মহাশয় সেবারও কলিকাতার খ্যাতনামা চিকিৎসকগণকে চিকিৎসায় নিযুক্ত করিলেন এবং বাড়ীতে পত্র লিখিয়া ঐ সংবাদ প্রেরণ করিলেন।

সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া বাড়ীর সকলে কান্নাকাটি আরম্ভ করিলেন। আমিও কাঁদিয়া কাঁদিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম, কারণ সকলেই মনে করিল যে, তাঁহার জীবনের আশা আর নাই। আমরা ব্যস্ত হইব, কান্নাকাটি করিব, এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার পুত্রের ব্যাধিসংবাদ প্রায়ই বাড়ীতে দিতেন না। যখন রোগ বৃদ্ধি পাইত, তখন চিকিৎসা করাইয়া আরোগ্য করিতেন এবং পরে আমাদিগকে লিখিতেন। এবারে যখন ব্যাধির সংবাদ ব্যাধির অবস্থার মধ্যেই বাড়ীতে দিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই জীবনের আশা-ভরসা কম হইয়া গিয়াছে। কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপায় কয়েক দিন

পরেই কলিকাতা হইতে শ্বশুর মহাশয় পত্র লিখিলেন যে,—ব্যাধির উপশম হইয়া উঠিয়াছে, বিশেষ চিন্তার কারণ নাই। ইহাতে আমাদের মনে একটু শান্তি আসিয়াছিল।

আরও কিছু দিবস পরে শ্বশুর মহাশয়ের পত্র পাওয়া গেল,—রোগ একেবারে সারে নাই, পূর্ব্বে যেমন একটু একটু কাসি ছিল এখনও তদ্রূপ আছে। পূর্ব্বে যেমন অনতি পরিশ্রমের কাজকর্ম্ম করিতে পারিত, এখনও তাহাই পারে। বর্ত্তমানে জীবনের আশঙ্কা নাই। ইহাতে পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারিলাম না। প্রবল ঝড় বৃষ্টির সময় নিরাশ্রয় পথিক ত্রাস-কম্পিত হৃদয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে পথিপার্শ্বস্থ জনহীন কোন ভগ্নগৃহে আশ্রয় লইলে, তখন তাহার হৃদয়ের অবস্থা যেরূপ হয়, আমাদেরও হৃদয়ের অবস্থা তদ্রূপ হইয়াছিল। রোগের শেষ, ঋণের শেষ ও অগ্নির শেষ থাকিলে, পুনরপি বৃদ্ধি পাইয়া অমঙ্গল ঘটাইতে পারে।

আগুনের প্রবলা দাহিকা শক্তি জানে পতঙ্গ, পতঙ্গকে আকর্ষণ করিবার শক্তিও তাহার অধিক প্রবলা। শত শত স্বজাতীয় পতঙ্গকে অগ্নিমুখে প্রবেশ করিয়া জীবন হারাইতে দেখিতেছে,—তথাপিও নিজে অগ্নির সন্নিকটস্থ হইয়া তাপদগ্ধ-দেহে দশবার ফিরিয়া ঘুরিয়া দূরে যাইতেছে, আবার কে জানে, কেন পতঙ্গ জ্বলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হইবার জন্য, আগুনের দিকে ধাবিত হয়। এ কোন্ দেবতার কোন মহালীলা, কোন্ সঙ্কর্ষণের মহা-আকর্ষণ,

তাহা কেহ বুঝিতে পারে না। তবে সকলেই দেখে,—সকলেই বুঝে, এমন ঘটনা নিত্য ঘটিতেছে। কেবল পতঙ্গ বলিয়া নহে, মানব-পতঙ্গ ইন্দ্রিয়ের জ্বালাময় ভীষণ আগুনে পতঙ্গের ন্যায় বহ্নি অভিমুখে ধাবিত হইতেছে, জ্বলিতেছে, পুড়িতেছে, মরিতেছে এবং মরিয়া পাংশুস্তূপে পরিণত হইতেছে।

আমারি স্বামীও তখন সুরাসেবী বেশ্যাসক্ত ও কুসঙ্গীর সঙ্গাভিলাষী, কাজেই তিনি শারীরিক অবস্থা এবং জীবনের আশা উপেক্ষা করিয়া এই সময় পুনরায় পাপকার্য্যে পরিলিপ্ত ছিলেন। তাহা কিন্তু আমার শ্বশুর ঘুণাক্ষরেও জানিতে পারেন নাই। বলা বাহুল্য আমরা এত দূরদেশে থাকিয়া তাঁহার তখনকার কার্য্য ও প্রকৃত অবস্থা কি করিয়া জানিতে পারিব!

নবম উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

বুকের বোঝা।

বঙ্গের বরষা, তাহার বজ্র-বিদ্যুৎ বিকাশ ও বারিবর্ষণ সরাইয়া লইয়া, সে বৎসরের মত বিদায় লইল। শরৎ তাহার স্থান অধিকার করিয়া আপন শোভা-সম্ভার বিস্তার করিয়া বসিল; মাঠে মাঠে শ্বেতকাশকুসুম ফুটিল, বনে, জঙ্গলে, শ্যামলতার অগ্রভাগে কুসুমগুচ্ছ ঝুলিয়া সৌরভ বিস্তার করিল; গৃহস্থের উদ্যানে অপরাজিতা, টগর, গাঁদা, ও শেফালিকা ফুটিয়া প্রকৃতির অঙ্গ সাজাইয়া তুলিল। জলাশয়ের সমল সলিল অমল হইল এবং কুমুদ কহ্লার ও কমল-কুসুম ফুটিয়া দিগ্‌বধূকে অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করাইল। আকাশ মেঘশূন্য,—নীলবর্ণ ও সহস্র সহস্র উজ্জ্বল তারকামালায় সুশোভিত হইল এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলার মহদুৎসব—শারদোৎসবের ঘোষণা হইল।

সেবার আশ্বিন মাসের শেষাশেষী পূজা—আমার শাশুড়ী, শ্বশুর মহাশয়কে পুত্র সঙ্গে লইয়া পূজার সময় বাড়ী আসিবার জন্য অনুরোধ-পত্র পাঠাইলেন। কয়েক দিন পরে,—পঞ্চমীর দিন
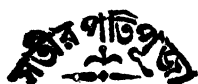
আমার শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পুত্রকে লইয়া বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

স্বামী আসিবেন,—তাঁহাকে দেখিয়া নয়ন চরিতার্থতা লাভ করিবে, হৃদয় ভরিয়া আনন্দের উৎস ছুটিতে থাকিবে,—প্রাণে উৎসাহের বিদ্যুৎ-প্রবাহ খেলিতে থাকিবে, কিন্তু তাঁহাকে দেখিয়া নিরাশা ও বিষাদের হিমানী সম্পাতে হৃদয় মন ও বৃত্তি সমুদয় জড়াইয়া পড়িল। বিষাদে হৃদয় পূর্ণ হইয়া গেল। তাঁহার শরীর কিছুমাত্র সারে নাই। পূর্ব্বের মতই জীর্ণ শীর্ণ এবং সেই কালান্তক কাসির পীড়া তাঁহার দেহকে আশ্রয় করিয়া সেইরূপই জুড়িয়া বসিয়া আছে। অধিকন্তু আমি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলাম, মহাপাতকের অত্যাচারের কালিমায় তাঁহার চক্ষুর নিম্নে যে কলঙ্করেখা পড়িয়াছিল, তাহাও বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। ওষ্ঠ সম্পূর্ণ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং ভাবভঙ্গীতে পাপাচারীর পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। তখন মনে মনে শ্রীভগবানকে ডাকিয়া কত কাঁদিলাম, তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য ও চরিত্র সংশোধনের জন্য কত প্রার্থনা করিলাম, শ্রীভগবান্ তাহা শুনিলেন কিনা, জানি না। অভাগিনীর প্রার্থনা শ্রীভগবানের চরণতলে পঁহুছিল কিনা, জানি না; সে সংবাদ কোথায় পাইব।

আমার স্বামী যে তখনও কুকার্য্যে লিপ্ত ছিলেন, একথা কেহই

জানিত না,—বিশ্বাসও করিত না। কারণ তাঁহার তখনকার যেরূপ শরীরের অবস্থা তাহাতে ঐ সকল কার্য্য করা তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। আমার শ্বশুর মহাশয়ও পুত্রের সহিত একত্রে কলিকাতায় থাকিয়া সে সকল বিষয় অবগত ছিলেন না; আমাদের গ্রামের আরও কয়েকজন উচ্ছৃঙ্খল যুবক কলিকাতায় থাকিত,—আমার স্বামী তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া ঐরূপ পাপকার্য্য করিতেন। তাহারা যে এখনও ঐ সকল পাপ কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা সকলেই বিশ্বাস করিত; কেবল আমার স্বামীর শারীরিক এত অসুস্থতার মধ্যে, যে ঐ কার্য্য করেন—তাহা কেহই বিশ্বাস করিত না।

বঙ্গের দুর্গোৎসবের পঞ্চমী ষষ্ঠীর আনন্দ উৎসব বাদ্যোদ্যমের সহিত অতিবাহিত হইল, তার পরে সপ্তমীবিহিত পূজা ও গীত বাদ্য ফুরাইল এবং দেখিতে দেখিতে মহাষ্টমীর দিবাভাগ কাটিয়া গেল; বৈকালে আমার স্বামী বেড়াইতে বাহির হইয়াছিলেন,—সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। যখন আসিলেন—তখন বোধ, হইল তিনি পাগল হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল ও পা টলিতেছিল, কথার পূর্ণ জড়তা অবস্থা দেখিয়া আমরা সকলে ভীত হইয়া পড়িলাম। তাড়াতাড়ি ধরাধরি করিয়া লইয়া গিয়া শয়ন করাইলাম। তাঁহার মাথা ঘুরিয়া উঠিল এবং বমি করিয়া সমস্ত বিছানা ও গৃহ ভাসাইয়া দিলেন। সে গন্ধ বুঝি
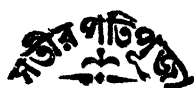
মহারৌরবের নরক গন্ধ হইতেও দূষিত। আমরাও ভাবিলাম তাঁহার জীবন-প্রদীপ বুঝি নির্ব্বাপিত হইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ;—তিনি বুঝি, আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া মহাযাত্রা করিবার আয়োজন করিয়াছেন। বহুদিনের সঞ্চিত ব্যাধি আজ প্রবলাকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে সংহার করিতে বসিয়াছে।

কিন্তু পরে জানিলাম বাস্তবিক তাহা নহে। তাঁহার শরীরের ব্যাধি বৃদ্ধি হয় নাই ; তিনি বেড়াইতে গিয়া তাঁহার উচ্ছৃঙ্খল পাপমতি বান্ধবগণের সহিত অতিরিক্ত সুরা সেবন করিয়া আসিয়াছিলেন। ব্যাধিক্ষীণ দুর্ব্বল শরীরে অতিরিক্ত সুরাবিষ সহ্য না পাওয়াতে ঐরূপ ঘটিয়াছিল।

আমি বা আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী সুরা কিরূপ দ্রব্য বা তাহার কিরূপ ক্রিয়া তাহা জানিতাম না। লোকে মদ খায়—আর উৎসন্ন যায় ইহাই শুনিতাম। তাহার আকার বা ক্রিয়া কিরূপ তাহা জানিতাম না। মদ ভাতে মাখিয়া খায় কি তামাকের মত কলিকায় সাজিয়া খায়, শসা কি কাঁকুড়ের মত চিবাইয়া খায়, তাহা কিছু অবগত ছিলাম না। মদ হইতে গোলাপ গন্ধ, বেলার গন্ধ, কি চাঁপা ফুলের গন্ধ বাহির হয় তাহাও অবগত ছিলাম না। তবে লোকে যখন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া মদ্য পান করিয়া থাকে এবং তাহার আসক্তিতে ইহ পরকাল নষ্ট করে, তখন সে এক অপার্থিব অমৃত আস্বাদবিশিষ্ট পারিজাত পুষ্পের রেণুর মত সৌরভবিশিষ্ট ও সোমরসের মত আনন্দদায়ক গুণ-

বিশিষ্ট হইতে পারে। কল্পনায় এইরূপ অনুভূত হইত। তখন জানিতাম না, লোকে যাহার জন্য ইহপরকাল হারায়, রক্তসঞ্চিত অর্থ জলের মত ফেলিয়া দেয়—ধূলি মুষ্টির মত ফুৎকারে উড়াইয়া দেয়, যাহার জন্য সমাজে ঘৃণ্য, ধর্ম্মে পতিত, মনুষ্যত্বের বহির্ভূত হইয়া যায়, যাহা সেবনে পৃথিবীর সমস্ত ব্যাধি আসিয়া মানবকে অকালে মৃত্যুকবলে কবলিত করে,—হরি হরি! তাহার গন্ধ, বিষ্ঠা হইতেও বিরক্তিজনক। এখন শুনিতেছি আস্বাদেও নাকি তাহা অত্যন্ত বিরক্তিজনক; কিন্তু হায়, তবে মানুষ তাহা খায় কেন? মজে কেন? মরে কেন?

আমি বা আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী সেই দুর্গন্ধময় গৃহে তাঁহার শয্যাপার্শ্বে তাঁহার অজ্ঞান-অসাড়-অবসন্ন-দেহের সন্নিকটে হতাশের কম্পিতবক্ষ চাপিয়া ধরিয়া সারা নিশি জাগিয়া কাটাইয়া দিলাম।

মহাষ্টমীর মহানিশি আমাদের এইরূপেই অতিবাহিত হইল। উষার শীতল বাতাসের সহিত যখন পূজার প্রভাতি বাদ্যের শব্দ আসিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমার শাশুড়ীর অনুজ্ঞাতে আমি সংসারের কার্য্য করিবার জন্য বাহির হইয়া গেলাম। যখন প্রভাতের নবোদিত সূর্য্য-করে পৃথিবী আলোকিত হইয়া পড়িল, তখন আমার শাশুড়ী বাহিরে আসিলেন। আমি গৃহমধ্যে গমন করিয়া সেই সমস্ত দুর্গন্ধ ক্লেদ পরিষ্কার করিয়া স্নান করিয়া

আসিলাম। গৃহমধ্যে গমন করিয়া দেখিলাম—তখন তিনি শয়ন করিয়া আছেন, কিন্তু বেশ জ্ঞান হইয়াছে। হতাশ প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন কেমন আছেন? তিনি তাচ্ছিল্যভাবে উদাস স্বরে বলিলেন,—ভাল আছি।

ইহার অল্পক্ষণ পরেই আমার ভয়ানক শীত অনুভব হইতে লাগিল এবং তাহার পরক্ষণেই প্রবল জ্বর আসিয়া আমাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিল। আমি কম্পিত অবসন্ন দেহে আপাদমস্তক লেপে আবৃত করিলাম। হঠাৎ এরূপ জ্বর কেন হইল, ইহা তখন বুঝিতে পারি নাই, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম;—সুরা-বিষের বিকারজনক উগ্রগন্ধই আমাকে পীড়িত করিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হউক, সে জ্বর আমার সহজে যায় নাই। চারি পাঁচ দিন লঙ্ঘন দিয়া এবং ডাক্তার আনাইয়া তাঁহার দ্বারা চিকিৎসা করাইয়া তবে আরোগ্য হই। কিন্তু যখনই আমার জ্ঞান হইত এবং পূজার বাদ্যধ্বনি আমার কাণে যখনই প্রবেশ করিত,—তখন আমি জগজ্জননী মহামায়া মা দুর্গার নিকটে আমার স্বামীর আরোগ্য প্রার্থনা করিতাম।

আমার স্বামী অপর দিবসই সকালে উঠিয়া পূর্ব্ববৎ চলিতে ফিরিতে লাগিলেন। কারণ তাঁহার ত রোগ বৃদ্ধি পায় নাই। আত্মকৃত মহাপাতকের ফলে,—দুর্ব্বল দেহে সুরা সেবনের জন্য ঐরূপ ঘটিয়াছিল মাত্র।

আমি আরোগ্য হইয়া উঠিয়া স্বামীর অনুগ্রহ লাভের জন্য কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবা করিতে চেষ্টা করিতাম। কিন্তু তিনি কিছুতেই আমার নিকটস্থ হইতে ভাল বাসিতেন না। কেন যে তিনি এরূপ করিতেন—তাহা আমি ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ভাবিয়া পাইতাম না। কখনও ভাবিতাম, ইহা আমার পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ঘটিতেছে, কখনও ভাবিতাম, আমার স্বামী কুক্রিয়াসক্ত এবং কুসঙ্গের সঙ্গী বলিয়া আমাকে তাঁহার ভাল লাগে না,—কখনও ভাবিতাম, কোন শয়তান বা শয়তানী তাহার সাধন মন্ত্রবলে উভয়ের মধ্যে এই ব্যবচ্ছেদ ঘটাইয়া দিয়াছে। এ যাতনা এ দুঃখ কষ্ট,—কিসে যায়, ভাবিতে গেলেই মনে হইত, শ্রীভগবানই এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার একমাত্র কর্ত্তা। দিবা নিশি মনে মনে তাই তাঁহাকে ডাকিতাম। বিপদে না পড়িলে বুঝি বিপদ্‌বন্ধু ভগবানকে কেহ স্মরণ করে না। বুঝি, মঙ্গলময় মধুসূদন এই কিশোর কালে তাই এ অভাগিনীর মাথায় অশান্তির এত বোঝা চাপাইয়া দিয়াছেন।

দশম উচ্ছ্বাস।

—•:•:•—

অবস্থান্তর।

অগ্রহায়ণ মাসে শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে কলিকাতায় লইয়া গেলেন। সেখানে গিয়া তিনি পুনরপি সেই মাড়োয়ারীর ঘরে কার্য্য করিতে লাগিলেন। ইহার চারি পাঁচ মাস পরে পুত্রের বেতন আনিতে গিয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার পুত্র কোন দিনই সময় মত কার্য্যালয়ে যাতায়াত করেন না। বাঁসা হইতে তাঁহার পুত্র কিন্তু ঠিক সময় বাহির হইয়া থাকেন এবং অধিক রাত্রে বাসায় ফিরিয়া আসেন। তখন পুত্রের চরিত্রের উপর তাঁহার যে সন্দেহ ছিল, তাহা বিশ্বাসে পরিণত হইল। এই সময় আমাদের দেশের একজন ভদ্র লোক কলিকাতায় বলরাম মজুমদারের ষ্ট্রীটে একখানি বাড়ী ভাড়া লইয়া সপরিবারে বাস করিতেছিলেন। আমার শ্বশুর সেই বাড়ীর একখানা ঘর ভাড়া লইলেন এবং আমার শাশুড়ী-ঠাকুরাণীকে লিখিলেন, যে বধূমাতাকে কোন বিশ্বাসী আত্মীয়কে সঙ্গে দিয়া এখানে পাঠাইয়া দিবে। এখানে বাসের জন্য ঘর ভাড়া করা হইয়াছে। শাশুড়ীঠাকুরাণী সেই পত্র পাঠ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং আমাকে কলিকাতায় কেন পাঠাইবেন,

তাহা ভাবিয়া চিন্তিয়া ঠিক করিতে পারিলেন না; কাজেই তখন পাঠাইলেনও না।

কয়েক দিনের পরও যখন আমরা কলিকাতায় গেলাম না, তখন শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে বলিলেন, "তুই দেশে গিয়া বধূমাতাকে লইয়া আয়। তোর মাকে বলিস্ আমার শরীরের অবস্থা খারাপ, তাই বাবা এই ব্যবস্থা করিয়াছেন। বাসায় আমার সময়মত খাওয়া নাওয়া ও রীতিমত শুশ্রূষা হয় না। পিতার আদেশে আমার স্বামী দেশে আগমন করিলেন এবং তাঁহার মাতাকে বলিয়া তিন চারিদিন পরে আমাকে লইয়া গমন করিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া আমি যে কয়মাস বাস করিয়াছিলাম, তাহার একদিন বা একমুহূর্ত্তও শান্তিতে কাটাইতে পারি নাই। রাত্রি ১১টার সময় তিনি বাসায় ফিরিতেন,—এবং আমার প্রতি কার্য্যই তাঁহার নিকট ভাল লাগিত না, সে জন্য আমাকে যথেষ্ট কটূক্তি করিতেন। অধিকন্তু তাঁহার সারারাত্রি অদম্য কাসির বেগ ও কষ্ট দেখিয়া আমার বুক ফাটিয়া যাইত;—তাহাতে আমি প্রায়ই চক্ষুর জল রাখিতে পারিতাম না। তিনি কিন্তু উল্টা বুঝিতেন —তিনি তাহাতেও কত কটূক্তি করিয়া আমাকে গালাগালি দিতেন। প্রায় রাত্রি উভয়ে জাগিয়া কাটাইতাম, তাহার কারণ, দুর্দ্দমনীয় কাশির বেগে সমস্ত রাত্রির মধ্যে তিনি চক্ষুর পাতা
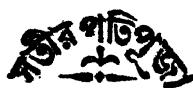
বুঝিতে পারিতেন না। তিনি ঘুমাইতে না পারিলে, আমিই বা ঘুমাইব কি প্রকারে, কাজেই অদূরে বসিয়া বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করিতাম।

ইহার কয়েক মাস পরেই আমাদিগকে দেশে যাইতে হইয়াছিল। এই সময় আমার শ্বশুর ও শাশুড়ী তীর্থভ্রমনার্থ ৺ পুরীধামে গমন করেন। আমি ও আমার স্বামীর দিদি-মা বাড়ীতে থাকিলাম, শ্বশুর শাশুড়ী ও আমার স্বামী তিনজনে বাড়ী হইতে রওনা হইলেন। কলিকাতায় পঁহুছিয়া কয়েকদিন সেখানে অবস্থান করিয়া শ্বশুর শাশুড়ী পুরীধামে গমন করিলেন, স্বামী কলিকাতাই রহিয়া গেলেন। তাঁহার বুঝি তখন বড় স্ফুর্ত্তির সময় উপস্থিত হইয়াছিল—তিনি যাহা চাহিতেন তাহাই প্রাপ্ত হইলেন। আমি তাঁহার শারীরিক অবস্থা ভাবিয়া ভাবিয়া বড় কষ্টে দিন কাটাইতাম এবং কোন্ দিন কি ঘটে,—কবে কেমন থাকেন তাহা জানিবার জন্য দুই একদিন অন্তর পত্র দিতাম। তিনি তাহার উত্তর প্রায়ই দিতেন না। যদি দৈবাৎ এক আধখানির উত্তর দিতেন, তবে তাহাও না দেওয়ার মত,—দুই এক লাইন লিখিতেন মাত্র। আমি তাহাই পুনঃ পুনঃ পাঠ করিতাম এবং চক্ষুর জলে অভিষিক্ত করিয়া কত যত্নে তুলিয়া রাখিতাম।

দেড়মাস পরে আমার শ্বশুর শাশুড়ী দেশে ফিরিয়া আসিলেন এবং কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

শুনিয়াছি, পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মফলে ইহজীবনে মানুষের সুখ দুঃখ সংঘটন হইয়া থাকে। হায়! পূর্ব্বজন্মে কি আমার কেহ ছিল না? আমি যখন পাতকরাশি সঞ্চয় করিতাম, তখন কি কেহই নিষেধ করিত না? ইহজীবনে আমার যে কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছিল,—তাহা বলিতে বাক্‌রোধ হইয়া যায়।

পূর্ব্বে তোমাদিগকে আমি যে সকল দুঃখ-কষ্টের কথা বলিয়াছিলাম, কেবল তাহাই যদি বজায় থাকিত, তাহা হইলে দিন যেমন কাটিতেছিল, তেমনই কাটিতে পারিত। এতদিনে আবার যে দুঃখের আগুন অত্যাচার অবিচারের লেলিহান জিহ্বা লইয়া দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিল, তাহা শুনিয়া তোমাদেরও চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রু না ঝরিয়া থাকিতে পারিবে না এবং আমাকে বলিবে,—তুমি তখন মরিলে না কেন? সে অবস্থায় বাঁচার চেয়ে মরাই মঙ্গল।

আমিও মরিবার জন্য অনেক দিন প্রস্তুত হইয়াছিলাম; কিন্তু আমার স্বামীর শরীরের যেরূপ অবস্থা এবং মধ্যে মধ্যে তিনি যেরূপ শয্যাশায়ী হইয়া পড়িতেন, সে সময় পাছে তাঁহার শুশ্রূষার ত্রুটি হয়, সেই ভয়েই মরিতে পারিতাম না। নতুবা রাত্রি দিন মরণ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া থাকিব কেন?

তোমরা শুনিলে অবাক্ হইয়া যাইবে যে,—এই সময় আমার স্বামীর আত্মীয়েরা পাপ কল্পনার সাহায্যে প্রচার করিলেন যে,

আমার স্বামী যে আমাকে ভালবাসেন না, তাহার কারণ আমি নাকি অসতী! হা ভগবান্! যাহার প্রতিদিন, প্রতিদণ্ড, প্রতিমুহূর্ত্ত স্বামীর আরোগ্য কামনা ব্যতীত অন্য কামনা—বাসনা—হৃদয়ের জাগিত না, এমন কি আহার নিদ্রার বিষয়ও মনে স্থান পাইত না, তাহার উপর এই দোষারোপ যাহারা করে, তাহাদের জিহ্বা বজ্রবিদগ্ধ হয় না কেন? তুমি ত অন্তর্য্যামী,—তুমি ত সকলেরই অন্তর দেখিতে পাও,—তবে আমার এ অত্যাচারদগ্ধ হৃদয়ে, এই নূতন রচা কথা প্রচার করিয়া যাহারা আমার নূতন দুঃখের সৃষ্টি করিল, তাহাদিগকে তুমি শাস্তি দিবে না কেন? তুমি না দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিয়া থাক? তবে হতভাগিনীর সময় নীরব কেন? হায়! আমার স্বামী যদি ইহা শুনিয়া আমাকে অবিশ্বাস করেন, তবে আমার গতি কি হইবে! আমি তাঁহার নিকট শত ভর্ৎসনা, সহস্র সন্তাড়না এবং শত সহস্র উপেক্ষা প্রাপ্ত হইয়াও কেবল সেবাধিকার পাইয়া এবং ভবিষ্যতে পাইব বলিয়া বাঁচিয়া আছি। যদি তিনি আমার সম্বন্ধে এই কথা বিশ্বাস করেন, তবে সেবাধিকার হইতেও নিশ্চয় বঞ্চিত করিবেন।

চারিদিকে দাবানল জ্বলিয়া উঠিলে, হরিণী যেমন বহির্গমনের পথ না পাইয়া, সেই অগ্নিপ্রাকারমধ্যে পড়িয়া ছটফট করিতে থাকে, আমার প্রাণও এই সকল অত্যাচারভাব-তপ্ত হইয়া সর্ব্বদা বহির্গমনের চেষ্টা করিয়াও বাহির হইতে না পারিয়া,—

যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিত এবং কোথায় যাই, কি করি, কাহার আশ্রয়ে যাই? দিন রাত্রি তাহার চিন্তা করিতাম ও শ্রীভগবান্‌কে ডাকিতাম। এইরূপে কিছু দিন অতিবাহিত হইলে, যখন একান্ত-মনে বিপদ্‌ভঞ্জন মধুসূদনকে ডাকিয়া ডাকিয়া নিরস্ত হইতাম,—তখন যেন কোথা হইতে আশ্বস্ত বাণী আসিয়া নিরাশ শুষ্ক হৃদয়ে আশার নীহারকণা ছিটাইয়া দিত। কে যেন কানের কাছে বলিয়া দিত,—"ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।" ধর্ম্মই ধার্ম্মিককে রক্ষা করিয়া থাকেন, মিথ্যা সত্যরূপে প্রকাশ পায় না। মিথ্যার আগুনের গড় সত্যের ফুৎকারে কোন্ দূর সমুদ্রের তটে পড়িয়া নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। সেই আশার বাণীতে ভরসা করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলাম। কিন্তু লজ্জায়, ঘৃণায়, ক্ষোভে আমি বাটীর বাহির হইতাম না, কাহারও সহিত ভাল করিয়া কথা কহিতাম না। স্নান আহার না করিলে নয়, তাই কোনরূপে সম্পন্ন করিতাম। তবে স্নানার্থিনী হইয়া, যে বিশুদ্ধ জলাশয়ে প্রতি-বাসিনী রমণীগণ স্নান করিতে যাইতেন—আমি সেখানে যাইতে পারিতাম না। পল্লীর প্রতি গৃহস্থের বাড়ীর পশ্চাদ্‌ভাগেই "কাণাপুকুর" বা ডোবা থাকে। সেই সকল পুকুরের চারিদিক্‌ বনজঙ্গলে আচ্ছন্ন থাকে; ঐ সকল বন জঙ্গল হইতে বৃক্ষপত্র পড়িয়া সেই জলকে বিষ করিয়া তুলে; সে জল কেহ খায় না, তাহাতে স্নান করে না, বা তাহা রন্ধনাদি কার্য্যে লয় না। কেবল
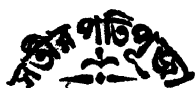
বাসনমাজা প্রভৃতি বাজে কাজে ব্যবহার করে। মানুষের মুখ-দর্শনভয়ে আমি সেই জলেই স্নানাদি সম্পন্ন করিতাম।

দিন যায়, তোমার আমার সুখ-দুঃখের দিকে ফিরিয়াও চাহে না। তবে সুখের দিন শীঘ্র কাটে, আর দুঃখের দিন বিলম্বে অতিবাহিত হয়। বাস্তবিক ইহা সত্য নহে, আমাদের মনের অবস্থা লইয়া এইরূপ জ্ঞান হয় মাত্র। আমার নিকট এই ঘটনার মধ্য দিয়া কয় মাস অতিবাহিত হইল। তাহারা যেন রূপকথার ব্রহ্মদৈত্যের মত বড় দীর্ঘাকৃতিবিশিষ্ট হইয়াছিল, তবে যাইতে হইল,—যাইতে সকলেরই হইবে!

ঘুরিয়া ফিরিয়া, দিন মাস, বৎসর ঠেলিয়া, কার্ত্তিক মাস আসিয়া উপস্থিত হইল। আমার শাশুড়ীঠাকুরাণী নবদ্বীপে যাইয়া রাস দেখিতে ইচ্ছা করিলেন এবং আমার শ্বশুরের নিকট কলিকাতায় পত্র লিখিয়া তাহা জানাইলেন। পত্র পাইয়া কয়েক দিন পরে শ্বশুর মহাশয় আমার স্বামীকে আমাদিগকে নবদ্বীপের বাড়ীতে লইয়া যাইবার জন্য দেশে পাঠাইয়া দিলেন। স্বামী বাড়ী আসিলে তিনি আমাকে কটু বলিবেন, ভৎসনা করিবেন, আমাকে তাঁহার সন্নিকটস্থ হইতে দিবেন না,—পূর্ব্বে এ সকল ঘটনা জানিয়াও তাঁহার আগমনে প্রাণে কেমন একটা আনন্দ আসিত। মনে হইত তাঁর অনেক আছে, আমার কেবল তিনি। শুধু কেবল দেখিয়া—শুধু কেবল সেবা করিয়া সুখী হইতাম। কিন্তু আজ তাঁহাকে

দেখিয়া বাত্যান্দোলনে বেতসী যেমন কাঁপে, আমার প্রাণও তেমনি কাঁপিতে লাগিল। মনে হইতে লাগিল,—মিথ্যা কলঙ্কের কথা শুনিয়া, যদি তিনি আমাকে অবিশ্বাস করেন,—ভর্ৎসনা করেন, তবে আমি কখনই তাহা সহ্য করিতে পারিব না।

সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে লাগিলাম, আর মনে মনে বিপন্নের আশ্রয় বিপদবন্ধু সতীর সহায় শ্রীপতিকে ডাকিতে লাগিলাম। সে দিন কাটিয়া গেল, স্বামীর হাবে ভাবে,—কথায় বার্ত্তায়, তাড়না—ভর্ৎসনায়, বুঝিতে পারিলাম, নূতন কথা সেদিন তিনি কিছু শুনিতে পান নাই। কারণ, পূর্ব্বে যেরূপ ভাবে কথা কহিতেন, সেদিনও তাহাই কহিলেন। আরও দুই দিন কাটিয়া গেল। তিন দিনের দিন মধ্যাহ্নকালে দেখিলাম, তাঁহার মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত স্থির গম্ভীর। দর্পণে হাই দিলে, তাহা যেমন ঘামিয়া উঠে আমার সর্ব্বাঙ্গ তেমতি ঘামিয়া উঠিল। কচি কলার পাতে আগুনের সেক্ দিলে, তাহা যেমন বিবর্ণ ও শুষ্ক হইয়া উঠে, আমার মুখও তেমনি ভাব ধারণ করিল। উচ্ছৃঙ্খল বায়ু-চালিত হইয়া, লতা যেমন আশ্রয়বৃক্ষবিচ্যুত হইয়া ভূমিতলে লুটাইয়া পড়ে, আমিও তেমনি পড়িতে যাইতেছিলাম, কিন্তু সামলাইয়া লইলাম। গৃহমাঝে বসিয়া স্বামী একাকী চিন্তা করিতেছিলেন; আমি যে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, তাহা তিনি জানিতে পারেন নাই। আমিও কোন সাড়া শব্দ করিলাম না;

প্রাণহীন কাঠের পুতুল যেমন দাঁড়াইয়া থাকে, স্বামীর চিন্তাক্লিষ্ট মুখের দিকে চাহিয়া তেমনিই দাঁড়াইয়া থাকিতাম। মনে মনে বুঝিতে পারিলাম—নিশ্চয়ই তিনি এই হতভাগিনীর কলঙ্ক-কথা শুনিয়া প্রাণে দুর্বিষহ জ্বালা অনুভব করিতেছেন। মনে হইল, ছুটিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে ধরিয়া বলি,—হতভাগিনী দাসী আপনার নিকট শত অপরাধে অপরাধী হইলেও অবিশ্বাসিনী নহে। আপনার সেবা শুশ্রূষা মনের মত না করিতে পারিলেও আপনি ভিন্ন তাহার ধ্যানের দেবতা, অপর কিছুই নহে, আমার হৃদয় চিরিয়া দেখুন, ইহার প্রত্যেক রক্তবিন্দুতে আপনিই প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু পারিলাম না। সাহসে কুলাইল না। তিনি যদি মনে করেন—যে রমণী ব্যভিচারিণী, যে রমণী এরূপ মহাপাতক করিতে পারে, সে দুইটা মুখের কথায় সন্তুষ্ট করিতে অপারগ হইবে কেন? ক্ষতমস্তক কুক্কুরী যেমন কোথায় যাইবে, কি করিবে, ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া, ছটফট্ করে, আমারও প্রাণ তেমনই করিতে লাগিল। কম্পিত-বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া রুদ্ধ নিশ্বাসে কেবল ভগবানকে ডাকিতে লাগিলাম।

ঠিক এই সময়ে যেন যমুনা-তট হইতে সাঁঝের বাঁশী বাজিয়া উঠিল,—স্বামী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিয়া উঠিলেন—"মিছে কথা। আমারই ভুলে, আমারই কঠোর অত্যাচারে, আমারই অনাদরে, লোকে মিথ্যা কথা সৃষ্টি করিয়াছে।

কেহই অপর কোন কারণ দেখাইতে পারে না। কেবল বলে যে স্বামী যখন তাহাকে দেখিতে পারে না, তখন নিশ্চয়ই সে অসতী; কিন্তু আমি ত বিশেষরূপে অবগত, যে জন্য এই পাঁচ বৎসর কাল তাহার উপরে আমি পৈশাচিক অত্যাচার করিয়া আসিতেছি, এখনও যদি সেই অভাগিনীকে আশ্রয় না দেই,—এখনও যদি তাহার প্রতি অত্যাচার করি, তবে ধর্ম্মে সহিবে না।"

আমি আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। ছুটিয়া গিয়া তাঁহার চরণযুগল চাপিয়া ধরিলাম এবং অশ্রুসিক্ত করিয়া বলিলাম—আপনি আমার দেবতা, আপনি আমার আশ্রয়, আপনিই আমার অন্তর্য্যামী; আপনি সব জানেন, আপনাকে অধিক কি বলিব। আপনি ব্যতীত আর শ্রীভগবান্ ব্যতীত কাহারও নাম যেন আমি কখনও মুখে আনি না। আপনার এতদিনের কটূক্তি, এতদিনের অনাদর, এতদিনের ভর্ৎসনা তাড়না, আজ আপনার সুবিচারে আমার হৃদয়ে সুধার ধারা বর্ষণ করিল! আজ বুঝিলাম—আমি জন্ম জন্ম পুণ্য করিয়া আপনার গলায় মালা দিয়াছিলাম।

এই ঘটনার দুই তিন দিন পরে আমার স্বামী আমার শাশুড়ী ও আমাদিগকে লইয়া নবদ্বীপধামে গমন করিলেন। দেশ হইতে একজন কর্ম্মচারী আমাদিগের সঙ্গে গিয়াছিল, নবদ্বীপ পঁহুছিয়া সেই কর্ম্মচারীকে আমাদিগের নিকট রাখিয়া আমার স্বামী কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

একাদশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

নবালোক।

নবদ্বীপ তখন রাস-উৎসবে প্রমত্ত। হেমন্তের আবিল প্রকৃতি শারদীয়া প্রকৃতির পরিত্যক্ত সুগন্ধি, প্রফুল্ল মল্লিকা মালা পরিত্যাগ করে নাই। আকাশের চাঁদ কুয়াসায় ঈষৎ মলিন-মুখ হইলেও বড় মধুর শোভায় গঙ্গার বীচিবিক্ষোভিত বক্ষে, শ্যামলিন বৃক্ষশাখাগ্রে—প্রাসাদশীর্ষে—উন্মুক্ত জানালা পথে—সর্ব্বত্রই কর-ধারা ঢালিয়া দিতেছিলেন। তাঁহার প্রেম-সোহাগে সোহাগিনী তারার মালা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া বুঝি নবদ্বীপের রাসের মধুর লীলা দেখিবার জন্য ব্যগ্র ছিল। দোকান পসারি আসিয়া সমগ্র নবদ্বীপ জুড়িয়া বসিয়াছিল এবং নিশাকালে তাহাদের সজ্জিত বিপণিতে বিপণিতে দীপ জ্বলিয়া, তাঁহাদের প্রতিচ্ছবি গঙ্গার অমল-ধবল-জলে ভাসাইতেছিল।

সমগ্র নবদ্বীপে দিন রাত্রি তখন খোল, করতাল বাজিত; হরিসংকীর্ত্তনের মধুর রোলে নবদ্বীপ যেন অভিসার-লালসায় কার উদ্দেশে টলমল করিতেছিল। আমরা রাস-পূর্ণিমায় গঙ্গাস্নান ও রাস-উৎসব দর্শন করিয়া নবদ্বীপে বড়ই প্রীত হইয়াছিলাম।

কার্ত্তিকী পূর্ণিমায় নবদ্বীপে যে দৃশ্য দর্শন করা যায়, বুঝি

জগতের আর কোথাও তেমন দৃশ্য—তেমন ভাব খুঁজিয়া মিলে না। তখন এখানে শাক্ত বৈষ্ণবে বিয়োগ বিভিন্নতা বিদূরিত হয়। এক সঙ্গে,—এক মিলনে উভয়ের উৎসবানন্দে অপূর্ব্বধারা যেন প্রত্যেক মানব-মানবীর প্রাণ-পুরে প্রেরিত হইয়া প্রত্যেক পরমাণুপুঞ্জকে পুলকিত করিয়া তুলে। পতিতপাবনী গঙ্গা সেই পুলক উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত হইয়া শত শত পতিত নর, নারীকে পাতক হইতে বিমুক্ত করিয়া থাকেন।

দিনত্রয় ধরিয়া নবদ্বীপে যে আনন্দ উৎসব হয়, তাহা বর্ণনা করা একান্তই অসাধ্য। নবদ্বীপের, শিব, শক্তি, বিষ্ণু, গণেশ, ব্রহ্মা সূর্য্য এবং শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গদেবের কত প্রকার মূর্ত্তি, কত বিভিন্ন ভাবদ্যোতক বিগ্রহ, কত লীলার কত ভাবময় প্রতিচ্ছবি, মন্দিরে, মঠে ও পূজার গৃহে প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাহা গণিয়া সংখ্যা করা যায় না। সে সকল মূর্ত্তি দেখিলে পাষাণ-প্রাণেও ভক্তির সঞ্চার হয়; তদ্‌ভিন্ন এই সময় নবদ্বীপে শ্রীশ্রী৺পটেশ্বরী পূজা হয়; সে প্রতিমা কি সৌন্দর্য্যকলায় সংগঠিত হয়, তাহা যাঁহারা না দেখিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন না। ঘুরণির বিখ্যাত কুম্ভকারগণ আসিয়া মৃণ্ময়ী প্রতিমার গঠনকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, এবং কৃষ্ণনগরের শিল্পিগণের স্বহস্ত নির্ম্মিত ডাকের সাজে সে প্রতিমার অঙ্গ সাজান হয়, বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বিগণও সে ভাব, সে শোভা, সে সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়া থাকিতে পারে না।
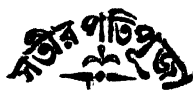
আমরা কয়েক দিন ধরিয়া এই সকল দর্শন করিয়াছিলাম। তারপরেও তিন চারিমাস নবদ্বীপে ছিলাম, বড় সুখে, বড় শান্তি-তেই সেই সময়গুলি কাটাইয়াছিলাম। আমার বোধ হইয়াছিল, আমি যেন আমার জীবনের এতদিন কাহার অভিশাপে—কোন দানবের অবরুদ্ধ নরকে পড়িয়া কেবলই যাতনা পাইতেছিলাম। আর এতদিনে শ্রীভগবান আমার করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করিয়া আমার স্বামীকে গুরুরূপে প্রেরণ করিয়াছিলেন; তিনি নরক হইতে আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া ভূস্বর্গের—এই পুণ্যভূমির আনন্দ-কোলাহলমধ্যে রাখিয়া গিয়াছেন। আমার সর্ব্বদুঃখ দূর হইয়া গিয়াছে, আমি তখন শ্রীভগবানের শ্রীচরণের অপার মহিমা এবং আমার স্বামীর অসীম করুণা ভাবিয়া ভাবিয়া মুগ্ধ হইয়া পড়িতাম এবং ভাবিতাম, সাধিলেই সিদ্ধি হওয়া যায়, সহ্য করিলেই সব মিলে।

কিন্তু এক ভাবনা, এক চিন্তা, তখন আমার হৃদয়ে দৃঢ়বদ্ধ কীলকের মত চাপিয়া ধরিয়া বসিয়া থাকিত; সে ভাবনা সে চিন্তা আমার স্বামীর কাসরোগ। আমি প্রতিদিন প্রত্যূষে গঙ্গাস্নানান্তে ঊর্দ্ধমুখে যুক্তকরে পূর্ব্বাভিমুখে দাঁড়াইয়া নবোদিত রক্তাম্বুজ তরুণ সূর্য্যদেবকে স্বামীর রোগ আরোগ্যের জন্য কত ডাকিতাম, কত প্রার্থনা করিতাম। তারপরে যত বিগ্রহ দর্শন করিয়া ফিরিতাম, প্রত্যেকের দুয়ারে মাথা কুটিতাম।

এই সময় একদিন আমার স্বামী নবদ্বীপে আগমন করিলেন। শীতের নিদারুণ কষ্টের মধ্যে কোকিলের স্বরবিস্তার ও মলয়ের মৃদু সঞ্চারে জীব যেমন বসন্তের আগমন অনুভব করিয়া ভাবী সুখের আশায় একটু আশান্বিত—একটু উৎসাহান্বিত হইয়া শ্রীভগবানকে ধন্যবাদ দেয়, আমার স্বামীর অবস্থা দেখিয়া আমিও সেদিন তদ্রূপ হইয়াছিলাম। তাঁহার রোগবিশীর্ণ দেহ তখনও রুগ্ন ছিল, কিন্তু তাহাতে যেন রক্তকণিকা সকল চলিতে আরম্ভ করিয়াছে—দেহের ধমনীতে যেন একটু রক্ত-প্রবাহ পরিলক্ষিত হইতেছিল, ও জীবনশক্তি যেন একটু জাগিয়া বসিয়াছে। চক্ষু তখনও রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমার ন্যায় ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া কোটরগতই ছিল; কিন্তু তাহার নিম্ন হইতে কলঙ্ককালিমা-রেখাগুলি উঠিয়া গিয়াছে। ওষ্ঠসম্পুটে রক্তরেখা ভাসিয়াছে। পাণ্ডুর গণ্ডে লালের আভা ফুটিয়াছে। আর সেই দুর্দ্দমনীয় কাস বারে অনেক কমিয়া গিয়াছে এবং পূর্ব্বেকার ন্যায় কষ্টদায়ক আর নাই!

যখন তাঁহাকে নির্জ্জনে পাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম,—এখন আপনি কোন্ ঔষধ খাইতেছেন? আমার জ্ঞান হইতেছে, এবার আপনার রোগ আরোগ্য হইবে।”

তিনি বলিলেন,—“আর কোন ঔষধ খাইতেছি না,—এই কয়বৎসর ধরিয়া কলিকাতার প্রায় সকল ডাক্তার কবিরাজেরই ঔষধ খাইয়াছি। সন্ন্যাসী মহন্তের—অনুজ্ঞাত আদেশ পালন

করিয়াছি। শত শত কবচ-মাদুলি ধারণ করিয়াছি। কিছুতেই কোন ফল পাই নাই; এখন ভরসা শ্রীভগবান্। তাঁহারই চরণ তলে দেহভার ন্যস্ত করিয়া জীবনের কর্তব্য কর্ম্ম—সাধিয়া রাখিব, আর ঔষধ খাইব না।

আমি চমকিয়া উঠিলাম; কাহার মুখে কি শুনিতেছি! যে মুখ দিয়া সুরার পূতিগন্ধ বাহির হইয়া বায়ুমণ্ডলকেও দূষিত করিয়াছে, সেই মুখে শ্রীভগবানের করুণার কথা কীর্ত্তন! যে হৃদয় বেশ্যার আসক্তি লইয়া আগুনের গড় সাজাইয়া বসিয়াছিল এবং সমস্ত সদ্বৃত্তিগুলিকে পোড়াইয়া ধ্বংস করিয়া অভিশপ্ত সগরসন্তানগণের ন্যায় পাংশুস্তূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিল, আজ কোন্ ভগীরথ কোন্ ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে নারায়ণ-চরণামৃত মন্দাকিনী বারি ধারা আসিয়া তাহাদিগকে বাঁচাইয়া তুলিল! আমি আনন্দপুলকে গদ্‌গদ কণ্ঠে বলিলাম,—"এবার আপনার রোগ নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।"

তিনি আমার অশ্রুভারাকীর্ণ চক্ষুর উপর কি জানি কেন তাঁহার উদার-স্থির-মধুর-সুধার আধার চক্ষুর দৃষ্টি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বুঝি আমার জীবনে,—জন্মে-জন্মে, কোন জন্মে এমন সুখ—এমন আনন্দ—এমন আবেগ বিহ্বলভাব কখনও অনুভব করি নাই। মনে হইল, এখন কি মরিতে পারি না? এ সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে, যদি জীবনে আর এ শুভমুহূর্ত্তের দেখা না পাই?

কিয়ৎক্ষণ পরে আমার সে সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া, সে মোহময়—আনন্দময়—প্রেমময়—দৃষ্টির সংস্থাপন সরাইয়া লইয়া বলিলেন,—"এবার আমার রোগ আরোগ্য হইবে তুমি কিসে জানিলে?"

আমি আত্মসংবরণ করিয়া তদুত্তরে বলিলাম,—"তা বলিতে পারি না, তবে আমার যেন তাহাই মনে হইতেছে।"

স্বামী সে কথায় আর আলোচনা করিলেন না; বলিলেন—"তোমাদিগকে কলিকাতায় লইয়া যাইব।"

আমি। কেন?

তিনি। কলিকাতায় বাড়ীভাড়া লইয়াছি, তোমাদিগের সকলকেই সেখানে লইয়া যাইব। আর দূরে দূরে থাকা যেন ভাল লাগে না।

আমি। আমরা সেখানে গিয়া কোথায় থাকিব? সেবার কলিকাতায় গিয়া যেখানে ছিলাম, সে বড় সুখজনক স্থান নহে। বিশেষতঃ সকলকেই সেখানে থাকা আদৌ চলে না।

তিনি। না, না,—এবার চাঁপাতলা ষ্ট্রীটে একখানি তেতলা বাড়ী এক বৎসরের জন্য এগ্রিমেণ্ট করিয়া ভাড়া লইয়াছি সেখানে সকলেই সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব।

সে দিনটা আমার যে কি সুখে অতিবাহিত হইয়াছিল, তাহা তোমাদিগকে বলিয়া কি জানাইব? মেঘাচ্ছন্ন অমানিশার ঘোর-অন্ধকারে সহসা যদি পূর্ণচন্দ্রের উদয় হইয়া দিক্ সমুদয় জ্যোৎস্নায়

পুলকিত হয়, হঠাৎ যদি বহুকালের পুরাতন শ্মশানভূমিতে সৌধ-কিরীটিনী দেবার্চ্চনার বাদ্য-কোলাহলমুখরিতা নগরীর সংস্থাপন হইয়া পড়ে, তথাপি বুঝি আমার অতর্কিত আগন্তুক আনন্দের সহিত উপমিত হইতে পারে না। আমি কিন্তু সে সুখের রজনী বিনিদ্র অবস্থাতেই কাটাইয়া দিয়াছিলাম। আমার মনে হইতে-ছিল, মানুষ শ্রীভগবানের উপর আত্মনির্ভর করিয়া যদি দুঃখের কাল অতিবাহিত করিতে পারে, তবে সেই করুণাময় নিশ্চয়ই করুণাকণা বিতরণে তাহার সমস্ত কর্ম্মফল ও কষ্টরাশি ধ্বংস করিয়া সুখের আলোকে পুলকিত করেন। বুঝি খাদের সোনা অগ্নিসন্তাপে গলিয়া খাদ বিনষ্ট করিয়া তাহাকে খাঁটি হইতে হয় আমার জীবনই তাহার প্রধান সাক্ষিস্থল। আমি যদি আমার সেই সকল দুঃখের সময়ে অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া না থাকিতাম, আমি যদি শ্রীভগবানে আত্মনির্ভর করিয়া সে সময় নীরবে অশ্রুবিসর্জ্জনে সময়ের প্রতীক্ষা না করিতাম, আমি যদি শাস্ত্রের মহৎ বাক্য অবহেলা করিয়া, আত্মহত্যা করিতাম, তবে এ সুখের আলোক কোথায় দেখিতে পাইতাম? আমাকে আত্মহত্যার মহাপাতক বুকে করিয়া, প্রেতপুরের কোন প্রতপ্ত জলরাশিপূর্ণ বৈতরণীর কূলে কূলে কঙ্কর কণ্টকাবৃত বন্ধুর পথ বহিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিতে হইত! কোন রৌরব নরকের নিম্নস্তরে রুদ্ধ বায়ু, পূতিগন্ধের মধ্যে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতাম।

দ্বাদশ উচ্ছ্বাস।

•—০:*:০—

দৈবীদান।

ইহার পর আমরা সকলে আমার স্বামীর সহিত কলিকাতায় গমন করিয়া বাস করিতে লাগিলাম।

দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, আমাদের সাংসারিক সুখ স্বচ্ছন্দতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। পরের কার্য্যে সবিশেষ উন্নতি হয় না, বিবেচনা করিয়া আমার শ্বশুর বড় বাজার অঞ্চলে নিজেরাই একটি আড়ত খুলিলেন। কিন্তু তিনি যেখানে কাজ করিতেন, সেখান হইতে সম্পূর্ণ বিদায় পাইলেন না। তাঁহার মুনিবের মৃত্যু হইয়াছিল,—মনিবের স্ত্রী ও পুত্রগণ বলিলেন, তুমি ছাড়িয়া গেলে আমাদের কাজ চলিতে পারিবে না। যদি বৃদ্ধ হইয়া কার্য্যে অক্ষম হইয়া থাক, তথাপি কর্ম্মচারী দ্বারা কার্য্য চালাও। কাজেই তাঁহার কর্ম্ম পরিত্যাগ করা হইল না। আমার স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া নিজদের আড়তে কর্ম্মচারী রাখিয়া কাজ করিতে লাগিলেন। শ্বশুর মহাশয় মধ্যে মধ্যে যাইয়া তত্ত্বাবধান করিতেন। অল্পদিনের মধ্যে আমাদের কারবার
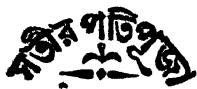
বেশ লাভজনক ও খ্যাতিপন্ন হইয়া উঠিল। আমরা সকলেই বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ও মনের আনন্দে বাস করিতে লাগিলাম।

ভগবান্ যত দেন—মানুষের অভাব বুঝি ততই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। আমরা যাহা যাহা চাহিয়াছিলাম, তিনি তাহা তাহা সব দিয়াছেন, তথাপি আবার আমাদের নূতন অভাবের অনুভূতি আসিয়া সংসারে প্রবেশ করিল। আবার আমরা প্রার্থনার করুণ বেদনা তাঁহার চরণপ্রান্তে নিবেদন করিতে আরম্ভ করিলাম।

আমার শ্বশুর শাশুড়ী বর্ত্তমান সুখালোকের মধ্যে অভাবের যে অন্ধকার দর্শন করিতে লাগিলেন, তাহা আমার সন্তান না হওয়ায়। আমার সন্তান হইবার বয়স যায় যায় হইয়া উঠিয়াছিল, কাজেই তাঁহারা তাঁহাদের পৌত্র মুখ দর্শনে বঞ্চিত থাকিবেন বলিয়া প্রায় সর্ব্বদাই দুঃখ প্রকাশ করিতেন। কোন কোন আত্মীয় স্বজন দুঃখটি নিবারণের উপায়ের জন্য আমার স্বামীর পুনরায় বিবাহ দেওয়ার সৎপরামর্শ দানে আমাকে কৃতার্থ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

আমি যদিও আগে সন্তানের সবিশেষ অভাব অনুভব করিতাম না, কিন্তু যখন জানিতে পারিলাম—আমার সন্তান না হইলে, আমার শ্বশুর শাশুড়ীর বংশ থাকিবে না এবং খুব সম্ভব আমার স্বামীকে আর একজনের স্বামী করিয়া দিয়া আমাকে পর করিবেন। তখন হইতে, আমার হৃদয়ের সুখের জ্যোৎস্না নিবিয়া উঠিতে লাগিল।

লাগিল। আমি আবার কাতর করুণ স্বরে করুণাময় শ্রীভগবানের চরণ-প্রান্তে প্রার্থনা করিতে আরম্ভ করিলাম, আমায় সব দিয়াছ প্রভু! কিন্তু দিয়া আবার লইবে কেন? আমাকে সন্তান দেও —আমার শ্বশুরের বংশ রক্ষা হউক।

এই সময় একদিন আমরা ৺কালীঘাটে জগন্মোহিনী জগন্মাতা শ্রীশ্রীকালী দর্শন করিতে যাই। মন্দিরের প্রবেশদ্বার হইতে ঐ এক প্রার্থনা,--মা আমাকে সন্তান দাও, যদি কাঙ্গালিনীকে সব দিয়াছ, তবে সন্তান না দিয়া আর দুঃখের হাহাকার তলে ফেলিয়া রাখিবে কেন? তুমি ইচ্ছাময়ী, তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়। আমার একটী সন্তান হওয়া কোন্ ক্ষুদ্র কথা! দয়াময়ি! দীনকর্ত্তী, তোমার দুয়ারে দাঁড়াইয়া যে ভিক্ষা করিয়াছি তাহা পূর্ণ করিও মা।

তৎপরে আমরা নাটমন্দিরের পার্শ্ব ঘুরিয়া মাতৃ-মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। সেখানে তখন বড় ভীড়, নরনারী তখন আত্মবিস্মৃত হইয়া স্ব স্ব পদগৌরব মুছিয়া ফেলিয়া নিজের বলাবল না বুঝিয়া মায়ের চরণকমল দর্শন-প্রয়াসে মন্দিরমধ্যে ছুটিতেছে। সেখানে তিল ফেলিবার স্থান নাই। পরস্পর পরস্পরের গাত্রঘর্ষণে পিষিয়া যাইতেছে, ঘামিয়া লাল হইয়া রক্তমুখ হইতেছে। তথাপি বিরাম—বিরতি নাই।

আমরা যখন মায়ের সন্নিকটস্থ হইয়া প্রথমে সে চরণ এবং

ভীষণ অথচ মধুময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম, তখন ভক্তিভরে সব ভুলিয়া গেলাম। মনে হইল, সত্যই ত্রিগুণময়ী মাতা আমাদের অভাব পূরণের জন্য মন্দিরে অবস্থিত। প্রণাম করিয়া সেই এক প্রার্থনা—সন্তান হইবার প্রার্থনা তৎপদে অর্পণ করিলাম। উঠিতে যাইতেছি, কি একটা গড়াইতে গড়াইতে আসিয়া আমার পায়ে ঠেকিল এবং কে যেন ডাকিয়া বলিল,—এটা লইয়া যা, স্নান করিয়া ভোজন করিস্, বাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।

বাঞ্ছাকল্পতরু করুণাময়ী কালী মায়ের দয়ার দান জানিয়া আমি হাতে তুলিয়া লইলাম এবং মুষ্টিমধ্যগত করিয়া সকলের সহিত মন্দিরে আসিলাম এবং যাইয়া দেখিলাম, সেটী একটী ক্ষুদ্র কচি আম। কাহাকেও কিছু বলিলাম না, বলা সঙ্গতই মনে করিলাম না। আমি শুনিয়াছিলাম, দেবতার বিষয়, স্বপ্নের বিষয়, মন্ত্রণার বিষয় কাহাকেও বলিলে তাহা ফলপ্রদ হয় না,—বরং অফলই হইয়া থাকে।

আরও আমার প্রাণের আশঙ্কা, যদি সত্য না হয়, তবে ইহা লইয়া নিশ্চয়ই আমাকে হাস্যাস্পদ হইতে হইবে। দৈবাদেশে যদিও আমার বিন্দুমাত্র অবিশ্বাস ছিল না, কিন্তু ঐ আদেশ যদি দৈবাদেশ না হইয়া আমারই মনের ভ্রান্তি হয়, ঐ ফল যদি দেবীর প্রেরিত না হইয়া কোন নর বা নারীর পদ চালিত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে আমার কাছে আসিয়া থাকে। কিন্তু সেই রাত্রেই

এমন ঘটনা ঘটিয়াছিল, যদ্দ্বারা আমি নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিলাম উহা দেবীর দয়ার দান।

কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন সুখ লইয়া বুঝি মানুষের সংসার করা চলে না। সুখ-দুঃখের ঘাত প্রতিঘাত লইয়াই বুঝি মানবের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করিতে হয়। সুখ-দুঃখের হাসি কান্না তাইহি বুঝি মানুষের ললাট-লিপি লিখিত হইয়া থাকে।

আমি জানিতাম এখন আমার স্বামী ব্যাধিমুক্ত হইয়াছেন। এখন আমার স্বামী কুসঙ্গ ত্যাগ করিয়া ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছেন। এখন আমার স্বামী অপব্যয় বন্ধ করিয়া দিয়া সঞ্চয়ের দিকে মন দিয়াছেন। এখন আমার স্বামী পাপের মূর্ত্তিমতী পিশাচীর পাপ প্রলোভন হইতে আত্মসংবরণ করিয়াছেন। কিন্তু এতদিনে জানিলাম, প্রকৃত তাহা হয় নাই। কিন্তু নদীর জলের মত আন্তর প্রবাহে অন্য পাপের লীলা তাঁহাতে প্রবাহিত হইতেছিল। একদিন রাত্রে আমার অসুখ করিয়াছিল, আমি আমার শাশুড়ীকে তাহা বলিয়া আসিয়া শয়নকক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম। তখন ঘুম নাই, কিন্তু নিদ্রিতার মতই অবস্থান করিতেছিলাম, আমরা যে ঘরে শয়ন করিতাম, সে ঘরখানি বেশ বড়—তাহার মধ্যস্থলে একটা কাষ্ঠের পর্দ্দা ছিল। পর্দ্দার একধারে আমাদের শয়নস্থান এবং অপর দিকে আমার স্বামীর বিশেষ বন্ধু-বান্ধব

আসিলে বসিবার স্থানরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। সেদিন তিনি তাঁহার একটী বন্ধুকে লইয়া আসিয়া তাঁহার বসিবার কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাহাকে সেখানে বসাইয়া রাখিয়া আমি যে কক্ষে শয়ন করিয়াছিলাম তথায় আগমন করিলেন; কিন্তু আমাকে ডাকিলেন না, আমিও কথা কহিলাম না। বোধ হয় তিনি বিবেচনা করিয়াছিলেন,—"আমি ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। তখন তিনি যেদিকে তাঁহার বন্ধু বসিয়াছিলেন, তথায় গমন করিলেন, এবং নিঃসন্দেহ চিত্তে উভয়ে কত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সে কথোপকথন তাঁহাদের পাপলীলা লইয়াই হইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া আমার মর্ম্মে মর্ম্মে আগুন জ্বলিয়া উঠিতেছিল। সে সকল ঘৃণ্য কাহিনী, মহাপাতকের জ্বলন্ত লীলা-কথা আমি মুখ দিয়া বলিতে পারিব না। আমার চোখ ফুটিয়া জল আসিতে লাগিল। আর ভগবানকে ডাকিয়া বলিতে ইচ্ছা হইতেছিল, ভগবান্, এই সকল পাপ-কথা শুনিবার জন্যই কি অভাগিনীকে জীবিত রাখিয়াছ। আমি যে কত আশার জ্যোৎস্নার পাতা কুড়াইয়া সুখের বাসর বানাইয়া বসিয়াছি, তুমি তাহা একদণ্ডের মেঘ-বজ্রপাতে বিনষ্ট করিয়া কেন দিলে, প্রভু? ইহার পূর্ব্বে আমার মরণ হইল না কেন, আমার স্বামী অবিশ্বাসী,—চরিত্রহীন, সুরাসেবী,—বেশ্যাসক্ত, ইহা শুনিয়া আমাকে জীবিত থাকিতে হইবে! যাহার স্বামী এরূপ মহাপাতকী, তাহার কোন্ পুণ্য কর্ম্মে অধিকার

আছে; বুঝি তোমাকে ডাকিবার অধিকারও তাহার নাই। তবে জীবনে কাজ কি? স্ত্রী স্বামীর সহধর্ম্মিণী, স্বামীর সহিত ধর্ম্মাচরণ করিয়া ভগবানের চরণ-রেণু লাভ করিতে পারিবে বলিয়া রমণীগণ সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। তাহাদিগের নিজস্ব কিছুই নাই,—স্বামীর ধর্ম্মের সাহচর্য্য করাই তাহাদিগের ধর্ম্ম, কিন্তু যাহার স্বামী মহাপাতকী তাঁহার স্ত্রীর মানবজন্ম ধারণ করা কেন? সে কি করিয়া ধর্ম্মাচরণ করিবে? কোটী কোটী জন্ম কীট পতঙ্গ পশু পক্ষীতে কাটাইয়া, তবে দুর্ল্লভ মানব জন্ম প্রাপ্ত হয়,—যদি তাহা তাহা এইরূপ ভাবে, ঘৃণিত পশুর আচারে কাটিয়া যায়, তবে অনর্থক সে জীবন বহন করা কেন?

স্বামীর বন্ধু উঠিয়া গেল, স্বামী ভোজনাদি করিয়া ঘরে আসিলেন। আমি আর চাপিয়া থাকিতে পারিলাম না; সকল কথা তাঁহাকে জানাইলাম, এবং নিশ্চয়ই আজ আত্মহত্যা করিব। যাহার স্বামী মহাপাতকী সেও পাপিনী। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী। অর্দ্ধাঙ্গ যদি পাপের লেলিহান আগুনে দগ্ধ হয়, তবে অপরার্দ্ধ কখনই পুণ্যের সুশীতল শান্তি-সলিলে স্নিগ্ধ থাকিতে পারে না।

পাপী—পাপ গোপন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকে, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমার স্বামীও মিথ্যার আবরণে সত্য গোপন করিয়া, মিথ্যা কথায় আমাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহার কোন কথা শুনিলাম
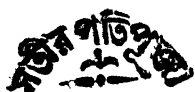
না ;—আমার সেদিনকার মনের অবস্থা অতিশয় শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। আমি হৃদয়াবেগে এতই উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিলাম, যে আত্মহত্যার জন্য ছুটিয়া যাইতেছিলাম, তিনি আমাকে জোর করিয়া চাপিয়া ধরিলেন এবং এক পদও অগ্রসর হইতে দিলেন না। আমি সেইখানেই বসিয়া পড়িলাম। আমার দুই হস্ত তখনও তাঁহার মুষ্টিবদ্ধ থাকায় যদিও অগ্রসর হইতে পারিলাম না, কিন্তু আমার দুই চক্ষুর জলে তাঁহার বাহু হইতে পদ পর্য্যন্ত প্লাবিত হইতে লাগিল।

শুনিয়াছি চক্ষুর জলে পাষাণ গলিয়া যায়—কঠিন প্রাণেও দয়ার সঞ্চার হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে আমার চক্ষুর জলে তাঁহার কঠিন প্রাণে দয়ার সঞ্চার হইয়াছিল কি না, জানি না। তবে তখন যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা কতকটা দয়ামাখান বটে। তিনি আমাকে বলিলেন,—কেন আত্মহত্যা করিবে? অনেক সহ্য করিয়াছ, আজ এত বিচলিত হইলে কেন? আত্মহত্যা মহাপাতক তাহা তুমি অবশ্য জান, বিশেষতঃ তোমার গর্ভে একটী সন্তান রহিয়াছে, তোমার দেহনাশে তাহারও বিনাশ হইবে। ইহাতে যে তোমার ঘোর নরক হইতে পারে।

কাহার মুখে কি কথা উচ্চারিত হইল? নরক! ইহকাল আছে পরকাল আছে, স্বর্গ আছে,—এ জ্ঞান কি তোমার আছে? প্রভু, যদি থাকে; তবে তুমি নিত্য নরক নিবাস কর কেমন করিয়া,

গার্হস্থ্য ধর্ম্মের স্বর্গীয় আলোকতল হইতে সরিয়া গিয়া বেশ্যা ও সুরার নরক অন্ধকারে বিচরণ কর কেমন করিয়া? হায় প্রভু; হা স্বামিন্;—তুমি যে নিত্য নরকের বাহ্নিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া প্রেতজীবনে বিচরণ করিতেছ,—তুমি যে সুরাবিষ পানে প্রমত্ত হইয়া পিশাচ-পিশাচীগণের সহিত রৌরবের পূতিগন্ধে আনন্দলাভ করিয়া ফিরিতেছ,—আমার নরকনিবাস কি তার চেয়েও কষ্টকর হইবে? হয় হউক; আমি আত্মবলি দিয়া—আমি নরক নিবাস করিয়া তোমাকে উদ্ধার করিব। আমার বিগতপ্রাণ দেহ দর্শনে যদি তোমার চৈতন্যের উদ্রেক হয়, যদি তোমার মতি গতি—যদি তোমার বুদ্ধিবৃত্তি—যদি তোমার আসক্তি ও অনুরক্তি ফিরিয়া সৎপথে আসে—যদি তুমি মানুষ হইয়া মানুষের মত সংসারে বাস করিতে পার; আমি নরকের অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া নরকনিবাস হইতে তাহা দর্শন করিতে পারিলে সুখী হইতে পারিব।

নারী জাতির স্বাতন্ত্র্য নাই—স্বাবলম্বন নাই—বুঝি পৃথক্ সত্তাই নাই। স্বামীর পুণ্যে তাহাদের পুণ্য—স্বামীর সুখে তাহাদের সুখ—স্বামীর আনন্দে তাহাদের আনন্দ।

জান তুমি প্রভু,—জান তুমি স্বামিন্? আমার এ আত্মহত্যার মূলে তোমার উদ্ধার কামনা; সুতরাং ইহা নিষ্ফল রোদনের হাহারব-মুখরিত আর্ত্তনাদ হইবে না; ইহা দধীচির দেহত্যাগের অস্থিবিনির্ম্মিত বজ্রের ন্যায় হইবে, সে বজ্রে তোমার চিরসঙ্গ পাপ-

বৃত্রাসুরের জীবন পাত হইবে। আমাকে ছাড়িয়া দাও, আমি আত্মহত্যা করিব।

তথাপি কিন্তু তিনি আমাকে পরিত্যাগ করিলেন না। তাঁহার হাতের মুঠার মধ্যে আমার হাতের প্রকোষ্ঠ পড়িয়া ঘামিতে লাগিল—আমার সর্ব্বাঙ্গ ঘামিতে লাগিল। মাথার কুন্তলাবদ্ধ কেশরাশি ঘামিয়া কতক পৃষ্ঠে, কতক দুই বাহুর উপর, কতক মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল এবং উন্মুক্ত গবাক্ষপথে বাতাস আসিয়া সেগুলি দুলাইয়া দিয়া গৃহের প্রদীপ কাঁপাইয়া আমোদিগকে শান্ত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল।

সে রাত্রি উভয়ে বসিয়াই কাটাইয়া ছিলাম। কেহ শয়ন করি নাই, বা নিদ্রা যাই নাই।

ত্রয়োদশ উচ্ছ্বাস।

—•:*:•—

আগুনে পড়িয়া পতঙ্গ পুড়িয়া মরে, তাহা সাক্ষাৎ দর্শন করিয়াও অপর পতঙ্গেরা পুড়িয়া মরিবার জন্য অমন করিয়া ছুটিয়া যায় কেন? কে বলিবে ইহার মীমাংসা? কোথায়! বেশ্যা-সক্ত পুরুষগণ সর্ব্বপ্রকারেই নির্জ্জিত হইতেছে। প্রকৃতির মহাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া দুরারোগ্য কঠিন কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইতেছে, জীবনে উপদংশ, যক্ষ্মা, মেহ, বাত প্রভৃতি ক্ষয়কর ব্যাধির কবলস্থ হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে, তথাপি তাহা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে না কেন? পত্নীর অপার্থিব ভালবাসা, পিতামাতার অসীম স্নেহ, ভ্রাতা ভগ্নীর অপূর্ব্ব ভক্তি ভালবাসা, শিশু সন্তানের করুণ আহ্বান, এসকল, পদদলিত করিয়া;—সমাজের নিন্দা ও ঘৃণা-ব্যঞ্জক অপবাদ সহ্য করিয়া, পিতৃপুরুষগণের বা নিজের কষ্টার্জ্জিত অর্থ বিনাশ করিয়া কুহকিনীগণের কুহকজালে মানুষ বিজড়িত হয়, কতদিন ইহা বিরলে বসিয়া ভাবিয়াছি, কিন্তু মীমাংসা করিতে পারি নাই। কোন কোন দিন মনে হইয়াছে, মোহ বলিয়া মানবে যে এক প্রবল শত্রু আছে, সেই শত্রুই প্রবলা-

কার ধারণ করিয়া মানুষকে নরকের গভীর গর্ত্তে নিপাতিত করিয়া থাকে। বুঝি একবার সে গর্ত্তে পতিত হইলে, মানুষ আর উঠিতে পারে না। উঠিবার ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষমতায় কুলায় না। জলমগ্ন ব্যক্তি যেমন ভাসিবার চেষ্টা করিলেও ডুবিয়া যায়, মোহগর্ত্তে নিপতিত মানুষও তেমনি উঠিবার চেষ্টা করিলেও নামিয়া পড়ে। তাই মানুষের কর্ত্তব্য, গোড়া হইতে সাবধান হওয়া। শুনিয়াছি, বারবিলাসিনী পিশাচী রমণীগণ পুরুষগণকে নারকীয় বাহু-বন্ধনে বাঁধিবার জন্য বিবিধ হাবভাব ও সাজ-সজ্জা লইয়া শীকারার্থী ব্যাধ যেমন বনে বনে বিচরণ করে, ইহারাও তেমনই সমাজমধ্যে বিচরণ করিয়া থাকে। দুঃখের বিষয়, যেখানেই সভ্যতা, সেখানেই নাকি ইহাদের বিচরণভূমির প্রশস্ততা অধিক সমাজ যদি ইহাদিগের প্রতি সমধিক ঘৃণা প্রকাশ ও নির্দ্দয় ব্যবহারে নগর হইতে বিতাড়িত করিয়া দেন, তাহা হইলে শত শত সোনার সংসার ছারেখারে যায় না। নিত্য নিশায় শত সহস্র সাধ্বীর চক্ষুর জলে বক্ষ প্লাবিত হয় না। শত শত বৃদ্ধ পিতা মাতা নিরন্ন ও শিশু সন্তান আশ্রয়-বিহীন হইয়া পড়ে না।

সমাজের কল্যাণকামনায় শত শত জ্ঞানী ও শক্তিমান্ ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান হইতে দেখা যায়—কেহ বিধবার বিবাহ দিতে ব্যস্ত, কেহ বর-পণ উঠাইয়া দিবার জন্য সভাসমিতি করিতেছেন,—কেহ পল্লীর রাস্তা-সংস্কার, কেহ পুলিশের অত্যাচার, কেহ গ্রাম্য

দলাদলি সংশোধন করিবার জন্য চীৎকার করিতেছেন। কিন্তু এই যে সমাজের মহা অকল্যাণকারিণী ধ্বংসবিধায়িনী রাক্ষসীগণ সমাজের বক্ষঃস্থলে বসিয়া, তাহাঁদেরই বংশধরগণের হৃৎপিণ্ড বিদারণ করিয়া চর্ব্বণ করিতেছে, তাহাতে কেহই ভ্রূক্ষেপ করিতেছেন না।

পূর্ব্বে আমি ভাবিতাম, আমার স্বামীর সামান্যমাত্র চরিত্রদোষ থাকিতে পারে, কিন্তু আমার প্রতি যে বিরূপভাব, তাহা তাঁহার শারীরিক অসুস্থতা জন্য ; কিন্তু এখন পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলাম, আমাকে তিনি কেন দেখিতে পারিতেন না। শয়তানের নরক-নিবাসের পার্শ্বে দেবতার মঠ বা চৈত্য থাকিলে শয়তানের তাহা কখনও ভাল লাগে না। একটী সত্য কথা বলিলে নিশ্চয়ই আপ-নারা আমাকে ঘৃণা করিবেন, কিন্তু যখন হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত করিয়া সত্য কথা বলিতে বসিয়াছি,—দুঃখের কাহিনী শুনাইতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছি, তখন যাহা ঘটিয়াছিল, যাহা সত্য, তাহাই বলিব।

স্বামী আমাকে পূর্ব্বে ভালবাসিতেন না, দেখিতে পারিতেন না, আমার সহিত কথা কহিতে ঘৃণা করিতেন ; কিন্তু এক মুহূর্ত্তের তরেও তাঁহার প্রতি আমার অভক্তি হইত না। আর যে দিন হইতে তাঁহার বন্ধুর সহিত বার-বিলাসিনী-বিলাসের ও সুরা সেবনের পৈশাচিক লীলার রসোদ্গার বা কৃতকর্ম্মের আনন্দ কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলাম, সে দিন হইতে দিন দিন যেন তাঁহার প্রতি অভক্তি জন্মিয়া উঠিতেছিল। ইহা আমার পক্ষে নিতান্ত

অন্যায় ও মহাপাতকীর কার্য্য তাহা আমি জানিতাম; তথাপি আমি কিন্তু কোন প্রকারেও হৃদয়াবেগ না থামাইয়া স্বামি-ভক্তির পরম পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইতে লাগিলাম। স্বামীর দিকে চাহিলেই যেন আমার জ্ঞান হইত, আমার স্বামি দেবতার স্বর্গ-বিচ্যুতি ঘটিয়াছে—তিনি মায়াকাননের বিষফল ভোজন করিয়া শয়তান সাজিয়াছেন এবং নরক-রাজ্যের সর্ব্ব নিম্নস্তর হইতে পূতিগন্ধময় গলিত নরকের কলসী মস্তকে লইয়া আমার সম্মুখে বিচরণ করিতেছেন। আমি কি করিয়া শ্রীভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপে তাঁহার চরণে আমার হৃদয় প্রস্ফুটিত ভক্তিকুসুমের মালা পরাইয়া দিব। কি করিয়া তাঁহাকে আমার জীবনের পথপ্রদর্শক শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ জ্ঞান করিব!

তথাপি মনকে বুঝাইবার শত সহস্র চেষ্টা করিতাম, মন বুঝিত না, এই জন্য আমার আরও দুঃখ। ভাবিতাম, দুর্লভ মানব জন্ম। ততোধিক দুর্লভ রমণী জন্ম লাভ করিয়া কোথায় উন্নতির দিকে অগ্রসর হইব, না অধঃপতনের দিকে পিছাইয়া পড়িলাম। রমণীজন্ম দুর্লভ, এই জন্য বলিলাম যে, অনন্ত ঈশ্বরকে সান্তভাবে—স্বামীরূপে সেবা করিবার অধিকার এমন আর কোথাও নাই। এইরূপেই হতভাগিনীর দিন কাটিতে লাগিল।

ইহার মধ্যে তাঁহাকে কত দিন বুঝাইতে গিয়া বিতাড়িত হইয়াছি। কত দিন তাঁহার নিকটস্থ হইয়া সুরা-বিজড়িত স্খলিত

বাক্য ও পৈশাচিক ভাবভঙ্গী দেখিয়া কপালে করাঘাত করিয়া রাত্রি কাটাইয়াছি।

মানুষের সুখে হউক, দুঃখে হউক, দিন কাটিয়া যায়—আমারও কাটিয়া যাইতে লাগিল। এই সময় আমার শ্বশুর আমাকে ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীকে লইয়া দেশে গমন করিলেন। তথায় তাঁহার মনের মত করিয়া আনন্দ-উৎসবে আমার পঞ্চামৃত, সাধভক্ষণ প্রভৃতি সম্পন্ন করিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিলেন।

আবার আশ্বিন মাস আসিল—আবার পূজার মহোৎসবে বঙ্গবাসী আনন্দ-চক্ষু উন্মীলিত করিলেন, আমার স্বামী এই সময় দেশে আসিলেন। দেশে আসিয়া কয়েক দিন বাড়ীতে থাকিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য উদ্‌যোগ আয়োজন করিলেন; আমি তাঁহাকে বলিলাম,—"আমাকে লইয়া কলিকাতায় চলুন।"

তিনি। এখন কলিকাতায় যাইবে কেন?

আমি। আমার শরীর ভাল নহে, প্রসবকালে কষ্ট পাইতে পারি।

তিনি। কলিকাতার লোকে প্রসব করিয়া তোমার সে কষ্টের লাঘব করিবে নাকি?

আমি। তা কি আর দিবে!

তিনি। তবে?

আমি। এখানে ভাল ধাত্রী মিলে না।
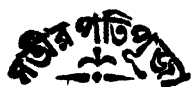
তিনি। এ দেশের লোকের ত আর প্রসব হয় না!

তাহার কথার যেরূপ স্বরভঙ্গী, তাহাতে বুঝা যায়, যে আমি কলিকাতায় তাঁহার সঙ্গে থাকিলে তাঁহার মহাপাতকের কার্য্যে কিছু ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। যাহা হউক, এখানে কয়দিন অবস্থানের পর তিনি কলিকাতায় চলিয়া গেলেন।

ইহার কয়েক মাস পরে আমার প্রসবকাল উপস্থিত হইলে, আমার শাশুড়ী কলিকাতায় শ্বশুর মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলেন যে,—এ সময় আপনাদের মধ্যে কেহর বাড়ীতে থাকা একান্ত কর্ত্তব্য। কেন না, বধূমাতার শরীর নানাবিধ রোগে আক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে যদি প্রসবকালে কোন কষ্ট হয় তবে আমরা স্ত্রীলোক—কি করিতে পারিব। পরে শুনিয়াছিলাম যে, পত্র পাইয়া শ্বশুর মহাশয় তাঁহার পুত্রকে বাড়ী পাঠাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেম; কিন্তু তিনি তাহার পৈশাচিক লীলার প্রেতভূমি কলিকাতা পরিত্যাগ করিতে স্বীকৃত না হইয়া ব্যবসা কার্য্যের ক্ষতি হইবে বলিয়া নানাবিধ মিথ্যা আপত্তি উত্থাপন করেন। সেই গুলিকে সত্য ভাবিয়া আমার শ্বশুর মহাশয় নিজেই দেশে আসিয়া পঁহুছিলেন।

শ্বশুর মহাশয়ের বাড়ী আসিবার পরে আমার একটী পুত্র-সন্তান প্রসূত হয়। সন্তান হইতে বাস্তবিকই আমি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছিলাম। যে সকল রোগ গুপ্তভাবে আমার দেহাধিকার

করিয়াছিল, তাহারা এক্ষণে পূর্ণরূপে প্রকাশ পাইয়া আমাকে জীর্ণ শীর্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল।

আমার শ্বাশুড়ী দেশের মধ্যে যেমন চিকিৎসা করান যায়—তাহা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাহাতে বিশেষ কোন ফল হইল না। কারণ একে দেশে মেয়ে-ডাক্তার নাই,—ভাল চিকিৎসকও নাই! তদুপরি যে সকল রোগ আমার ঘটিয়াছিল, লজ্জাক্রমে তাহার সমস্তগুলি অপরকে বলিতেও পারিতাম না।

এইরূপে কয়েক দিবস অতিবাহিত হইলে, আমার শ্বশুর তাঁহার পুত্রকে লিখিলেন,— তুমি বাড়ী আসিয়া সন্তান,মুখ দর্শন কর; কারণ ইহা গৃহস্তের ধর্ম্ম।

সে পত্র পাইয়া আমার স্বামী বাড়ী আসিলেন না।

একমাস অতীত হইলে ষষ্ঠী পূজাদি সমাপ্ত করিয়া আমি আঁতুর হইতে বাহির হইলাম।

তিনি বাড়ী আসিলেন না তাঁহার সন্তান তিনি দর্শন করিলেন না, ইহাতে আমার যে কি মনোবেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আপনাদিগকে কি জানাইব। তবে বুঝিতাম, তাহাতে আর তিনি নাই। মনুষ্যোচিত সদ্বৃত্তি তাঁহাতে বড় আর অধিক নাই। যাহা হউক, কয়েক দিন ভাবনা চিন্তা ও মীমাংসার পর তাঁহাকে একখানা পত্র লেখাই স্থির করিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম যে, আপনি আপনার সন্তান দেখিলেন না, ইহাতে আমার ও আপনার পিতা

মাতার মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ আমার দেহে এমন কতকগুলি রোগ জন্মিয়া গিয়াছে—যাহার আভাষ পূর্ব্বে আপনাকে দিয়াছিলাম, যাহা আপনি পূর্ব্বে গ্রাহ্য করেন নাই। এক্ষণে তাহাতেই আমি মরিতে বসিয়াছি। মরণ আমার পক্ষে মঙ্গলময় ও বাঞ্ছনীয় হইলেও আমি মরিলে আপনার সন্তানটীও মরিবে, সেই জন্য কিছুদিন বাঁচিবার প্রয়োজন। যদি আপনার সন্তানের মৃত্যু প্রার্থী না হন—তবে অবিলম্বে বাড়ী আসিবেন। আপনি ব্যতীত সে সকল রোগের কথা অপরকে বলা যায় না।

আমার ভাগ্যক্রমে হউক, আর নবজাত সন্তানের আকর্ষণেই হউক, সেই পত্র প্রাপ্ত হইয়া কয়েক দিবস পরে তিনি বাড়ী আসিয়া পঁহুছিলেন; এবং আমার নিকট রোগের অবস্থা শ্রবণ করিয়া তাঁহার মাতাকে বলিলেন,—ঐ রোগ কলিকাতায় না লইয়া গেলে কিছুতেই আরোগ্য হইবে না।

সকলেরই সেই মত হইল। শুভ দিন দেখিয়া সকলে মিলিয়া আমরা কলিকাতায় রওনা হইলাম। কলিকাতায় পঁহুছিয়া উপস্থিত মতে তথায় একটা বাড়ীর একটী প্রকোষ্ঠ ভাড়া লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম।

ইহার দিবসত্রয় পরে একজন মেয়ে-ডাক্তার ও একজন পুরুষ ডাক্তার আসিয়া আমার রোগ পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন—এরূপ গৃহে থাকিয়া এ রোগের চিকিৎসা হইবে না। বিশুদ্ধ বায়ু-

পূর্ণ প্রশস্ত গৃহে থাকিতে হইবে। অস্ত্রোপচার ও মাসেক কাল ঔষধ সেবন দ্বারা তবে এ রোগ আরোগ্য করিতে হইবে।

আমার শ্বশুর সে সকলই করিতে লাগিলেন। স্বামী মহাশয় সেই সকল বহুব্যয়জনক কার্য্যে যেন কিছু বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম,—এখন বিরক্ত হইলে চলিবে কেন? গোড়ায় যাহা নখে ছিঁড়িত, এখন তাহাতে কুঠারের প্রয়োজন হইয়াছে। যখন আমি বলিয়াছিলাম, তখন যদি আমাকে কলিকাতায় আনিতেন, তবে আমাকেও এত রোগের যাতনা সহ্য করিতে হইত না, আর আপনাকেও এত ব্যযভারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত না।

চতুর্দ্দশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

একতান।

আমি রোগশয্যায় পড়িয়া সেই নিদারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলাম,—রোগজীর্ণা মাতার নবপ্রসূত শিশুটীকে লইয়া আমার শাশুড়ী কষ্টে দিন কাটাইতে লাগিলেন,—চিকিৎসকগণের অনুজ্ঞাত ঔষধ পথ্যের আয়োজন করিতে আমার বৃদ্ধ শ্বশুর ব্যতিব্যস্ত ও ক্লান্ত হইয়া পড়িতে লাগিলেন,—আর আমার স্বামী—যিনি সেই নবজাত শিশুর জনক,—আমার ইহপরকালের আশ্রয়স্থল—আমার স্বামী নিত্য নিয়মিত বেশ্যা ও সুরা লইয়া দিন অতিবাহিত করিতেছিলেন।

আমার মর্ম্মবেদনা, আমার দুঃখ পুরুষ পাঠক বুঝিবেন না; পাঠিকা ভগিনীদিগকেও বুঝাইতে হইবে না। যে রমণী স্বামী কর্ত্তৃক উপেক্ষিতা—অনাদৃতা তাহার হৃদয়ে যে কি মর্ম্মন্তুদ বেদনা,—অসীম দুঃখ সর্ব্বদা লাগিয়া থাকে, তাহা বর্ণনা করিবার ভাষা বুঝি আজিও সৃষ্ট হয় নাই। বিশেষতঃ যাহার স্বামী বারবনিতার আসক্তি ও সুরা সেবনে প্রমত্ত হইয়া নিজ আত্মীয়

স্বজনে বীতরাগ, গুরুজনে ভক্তিহীন, পোষ্যবর্গে কৃপাশূন্য, সংসারে প্রধান অবলম্বন অর্থসঞ্চয়ে যত্নহীন, ব্যয়ে অপরিমিত হস্ত—তাঁহার আশা ভরসা কি ? দুঃখ দৈন্যেরইবা অভাব কখন ?

ঔষধ পথ্য ও যত্নের ত্রুটি না হইলেও ঐ সকল চিন্তায় আমার রোগ সারিয়াও সারিতেছিল না। আমি বুঝিয়াও ঐ চিন্তাকে হৃদয় হইতে কিছুতেই দূর করিতে পারিতাম না। আশ্রয়তরু কীট-দষ্ট হইয়া শুকাইতে আরম্ভ করিলে আশ্রিত-লতা কুসুম-পল্লবশোভিতা হইতে পারে কি ?

আগে বুঝি নাই—বুঝিলে মরুভূমে স্বহস্তে এমন মরণমঞ্চ গড়াইয়া তুলিতাম না। আগে বুঝি নাই,—বুঝিলে শ্রীভগবানের পাদপদ্মে তেমন করিয়া সুখের প্রার্থনা করিতাম না। আগে বুঝি নাই—সুখ চাহিলে দুঃখ আসিবে। সুখ আসিলেই দুঃখ আসে, জীবন চাহিলে মরণ আসে। আমি পূর্ব্বে যখন কষ্ট পাইতেছিলাম, তখন যদি শ্রীভগবানের পাদপদ্মে আমার নিজের সুখের জন্য স্বামীর আরোগ্য কামনা, সন্তানের জন্ম কামনা, সংসারে অর্থাগমের কামনা, না করিতাম এবং সেই দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় লইয়াই শুধু শ্রীভগবানের চরণ চিন্তা করিতাম, তাহা হইলে তিনি আমকে আমার আত্মোন্নতির দিকে টানিয়া লইতেন, প্রার্থনীয় সুখের বিষয় গুলি প্রদান করিতেন না।

তিনি সুখ দিয়াছেন, সুখের বিষয় দিয়াছেন,—প্রার্থনা পূরণ
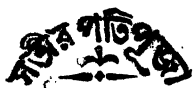
করিয়াছেন। তবে বলিয়াছি ত সুখ চাহিলে দুঃখ আসিবে, সুখ ভোগ করিতে গেলে দুঃখভোগ অনিবার্য্য।

পথহারা অন্ধ জন যেমন প্রান্তরমধ্যে পড়িয়া তাহার গন্তব্য দিক্ ভ্রান্ত হইয়া যায়,—কোন্ দিকে গেলে সে তাহার আশ্রয়-স্থানে পঁহুছিতে পারে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়াও চলিতে থাকে এবং চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি দূর হইতে ডাকিয়া, তাহাকে সৎপথে যাইবার উপদেশ দিলেও—সে যদি তাহা গ্রহণ না করিয়া আপন ইচ্ছামত বিপথে চালিত হইতে থাকে, তবে তাহার যেমন গন্তব্য-স্থানে পঁহুছান ঘটে না, কুৎসিতকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিগণও তদ্রূপ সদুপদেশ উপেক্ষা করিয়া অসৎপথে চালিত হইয়া থাকে। পরন্তু মনুষ্যোচিত গন্তব্যস্থানে পঁহুছিতে পারে না। আমার স্বামীর সেই দুর্দ্দশাই ঘটিয়াছে। মোহান্ধ চক্ষুতে তখন তিনি জীবনের সৎপথ হারাইয়া, অসৎপথে চালিত হইয়াছিলেন। আত্মীয় স্বজনের সদুপদেশ তখন তাঁহার কাছে একান্তই অগ্রাহ্য।

আর এক কথা। মানুষ যখন প্রাণপণে যাহা খুঁজে, তখন তাহাই পায়—ইহা নিত্য সত্য, এই সময় আমার স্বামী আর এক নূতন মহাপাতকে লিপ্ত হইয়াছিলেন। রাত্রিতে তিনি কখনই বাড়ীতে থাকিতেন না। আমরা কিন্তু তাহাতে ভূত দোষ ভাবিতাম না। আমরা ভাবিতাম, তিনি যে পাপ করুন—তাহা আমাদের জানিবার প্রয়োজন নাই। আহারের পর তিনি আর

এক বাড়ীতে গিয়া শয়ন করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও তিনি আহারাদির পর সঙ্গিগণের সহিত কোথাও কদর্য্য লীলায় বাহির হইতেন না; আড়ৎ-বাড়ীর সন্নিকটে আমার শ্বশুরের ভাড়া করা একটী ঘর ছিল, আমরা যখন দেশে চলিয়া যাইতাম, তখন সেই ঘরে আমাদের বাসাবাড়ীর সমস্ত জিনিষপত্র রক্ষিত হইত; পুনরায় যখন কলিকাতায় আসিতাম, তখন বড় বাড়ী ভাড়া লওয়া হইত এবং সকল দ্রব্য তথায় আনীত হইত। সে ঘরটী কিন্তু বার মাসের জন্যই থাকিত।

আমার স্বামী ঐ ঘরে শয়ন করিতেন।

পঞ্চদশ উচ্ছ্বাস।

—•:*:•—

বিপরীত-পন্থা।

এই সময় যাহা ঘটিয়াছিল, সে ঘটনার কথা বহুদিন পরে আমার স্বামীর মুখেই শুনিয়াছিলাম। কলিকাতার অদ্ভুত প্রতারণার-লীলা, পতিত যুবকের অপূর্ব্ব প্রতারণা ও দুঃখের কাহিনী, আর আমার স্বামীর জীবনের এক প্রধান ঘটনা ও আমার মর্ম্মান্তিক ব্যথা-বিদীর্ণ বক্ষের দীর্ঘশ্বাসমাখা জীবনকাহিনী এই স্থলেই বলিব।

যে ঘরে আমার স্বামী রাত্রে শয়ন করিতেন, তাহারই উত্তর পার্শ্বে একঘর ভদ্রলোক বাস করিতেন। সেই বাড়ীর এক সুন্দরী আমার স্বামীর নয়নপথের পথিক হন। চিত্তবৃত্তি সমুদায় অনুশীলনে ছড়াইয়া পড়িয়া থাকে। পাপ বিষয়ে যাহার চিত্ত, তাহার হৃদ্বৃত্তিগুলি ততই তদ্ভাবাপন্ন। মেঘগর্জ্জনে নদীর জল ফাঁপিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া কূল ছাপাইয়া অবশেষে যেমন তটভূমিতে উঠিয়া পড়ে, আমার স্বামীর সৌন্দর্য্য-উপভোগকামনা তেমনই এখন কূল ছাপাইয়া অকূলে প্রধাবিত হইতেছিল। তিনি ঐ গৃহাঙ্গনার রূপ দেখিয়া স্থির থাকিতে পারিলেন না; মনে করিলেন না সতীর

সতীত্ব নাশ করিতে গেলে, কুলাঙ্গনার কুল ধ্বংস করিতে হইলে, নিশ্চয়ই তাঁহাকে বিড়ম্বনার অশ্রুপাত করিতে হইবে।

তিনি কয়েক দিন তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া যখন মর্ম্ম-জ্বালায় বড় জ্বলিয়া উঠিলেন, তখন মহাপিশাচের মায়াজাল বিস্তার করিয়া সেই রমণীকে তাহার মধ্যে নিপাতিত করিয়া আপনার নরকবাসনা তৃপ্তিলাভ করিতে উদ্যত হইলেন। তদর্থে সেই বাড়ীতে এক নাপিতিনীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। একদিন নাপিতিনী যখন সেই বাড়ীর কার্য্য সমাধা করিয়া রাস্তায় উঠিতেছিল, তখন তাহাকে ডাকিয়া অতি আদরে আপনার গৃহে আনিলেন এবং অতি মধুর সম্ভাষণে সম্ভাষিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"যে বাড়ী হইতে তুমি কামাইয়া বাহির হইলে, উহারা কি জাতি?"

কলিকাতার নাপিতিনীগণ অতিশয় ধূর্ত্ত এবং প্রায়ই চরিত্র-হীনা; বিশেষতঃ যাহারা বাজার অঞ্চলে ক্ষৌর করিয়া থাকে, তাহারাই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সে জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন বাবু?"

স্বা। বলই না?

না। কায়স্থ।

স্বা। যদি কায়স্থ—যদি হিন্দু তবে উহারা খৃষ্টীয়ানের মত জামা-কাপড় পরে কেন? মেয়েরা প্রায়ই সায়া শামিজ পরে, জাকেট বডি গায় দেয়, এবং পরিধানের কাপড়ও কিছু নূতন রকমে
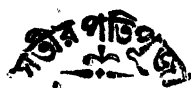
পরিধান করিয়া থাকে ; আর পুরুষগণ প্রায়ই একটু বিভিন্নাকারে বস্ত্রাদি পরিধান করে ও চলিতে ফিরিতে দেখিয়া থাকি।

না। উহারা হিন্দুই বটে কিন্তু তুমি কি জান না বাবু, আজ্ কাল কলিকাতাবাসিগণ ঐ রকম পরন পরিচ্ছদই করিয়া থাকে, এবং ভোজনে কোন জিনিষই আট্‌কায় না। কেন? আপনার সে কথা জিজ্ঞাসা করিবার কারণ কি?

স্বা। যাহা কারণ তাহা তোমাকে বলিব বলিয়াই ডাকিয়াছি। কিন্তু আমার কাছে তোমাকে শপথ করিতে হইবে,—তাহা তুমি কাহাকেও বলিবে না। যদি সম্পন্ন করিতে পার,—যদি আমার আশা পূর্ণ করিতে পার,—যদি আমার মরণযন্ত্রণা দূর করিতে সক্ষম হও,—আমি তোমাকে যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিব। আর যদি তাহা না পার, তথাপিও একথা কাহাকেও বলিও না। আমি তোমাকে তজ্জন্য যৎসামান্য কিছু দিব।

নাপিতিনী মৃদু হাসিল। বলিল,—"কলিকাতার নাপিতিনীগণ না পারে এমন কাজই নাই। যেখানে সূচ না চলে সেখানে ফলা চালাইয়া থাকে।"

স্বা। সেই জন্যই তোমাকে ডাকিয়াছি। দেখ, ঐ বাড়ীতে এক অতি মনোজ্ঞা ভুবনমোহিনী সুন্দরী বাস করে ;—যদিও আমি তাহাকে অনেক চেষ্টা করিয়াও পূর্ণভাবে দেখিতে পাই নাই ; চলিয়া ফিরিয়া যাইতে কোন দিন কেবল অলক্তকরাগরঞ্জিত

চরণ হইতে বসনাবৃত উরুদেশ পর্য্যন্ত,—কোন দিন জানালার ধারে আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু দুইটী, কোন দিন উন্মুক্ত জানালায় গৃহের মধ্যবর্ত্তিস্থলে পৃষ্ঠের সুগঠন ও গ্রীবার বিভঙ্গিশোভা দেখিয়াছি, এবং মরমে মরমে জর্জ্জরিত হইয়া মরিতেছি।"

নাপিতিনী—কলিকাতার চরিত্রহীনা শয়তানী বুঝি এই সময় মনে মনে আমার স্বামীকে পূর্ণরূপে চিনিয়া ফেলিল এবং ভাবিল 'উচ্ছৃঙ্খল যুবক তুমি,—ধনী-তুমি,—বাঙাল তুমি,—পোকার মত আগুন দেখিয়া ঝাঁপাইতে উদ্যত হইয়াছ, জ্ঞানহারা হইয়াছ, এই সময় গিরগিটি রূপে আমার সম্মুখে পড়িয়াছ, দেখি, আমি তোমাকে গ্রাস করিয়া তোমার রুধির, তোমার মস্তক, তোমার মাংস, তোমার অস্থিমালা কতদূর গ্রাস করিতে পারি! কালীগঙ্গা বুঝি আমার প্রতি মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। এতদিনে বুঝি আর আমাকে দুয়ারে দুয়ারে ফিরিয়া লোকের নখ-চুল ফেলিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে না।' জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন গো! সে সুন্দরী রমণীকে তোমার কি প্রয়োজন?"

স্বা। পূর্ব্বেই ত বলিয়াছি, তাহাকে দেখিয়া আমি অস্থির হইয়াছি।

নাপিতিনী হাসিল। সে হাসিতে বজ্র লুকান থাকিলেও তাহার প্রথম বিকাশ পিপাসার্ত্তের জ্বলিতকণ্ঠে জলধারা ঢালিবার আশার পরিচায়ক। হাসিল, হাসিয়া বলিল,—"শুধু নাম শুনেছি,
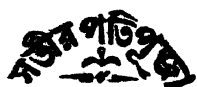
তবু চোখে দেখি নাই 'তড়িতের মত চলিয়া গেল, ভাল করিয়া দেখা না হ'ল, তথাপি মজিল মোর প্রাণ'—তাই নাকি বাবু?"

স্বা। ভগবান্ আমাকে উপযুক্ত লোকই মিলাইয়া দিয়াছেন, বোধ হইতেছে আমার আশার সুসার হইবে। তুমি কেবল নখ চুল কাটিয়া ফের না, স্বরসেও রসিকা বটে!

না। আর বাবু যে চা'ল ডা'লের দর তাতে রস শুকিয়ে গুড় হয়ে গেল। যা রোজগার করি, তাতে পেট চলে না। এখন খবর কি, বল দেখি?

স্বা। খবর আমার মাথা আর মুণ্ডু,—এত রসিকা হইয়াও বুঝিতে পারিলে না!

না। বুঝেছি গো, বুঝেছি! ঐ রমণীকে তোমার চাই,—কেমন?

স্বা। তোমার কাছে আমার প্রার্থনা ত তাই, এখন তোমার দয়া আর আমার কপাল! কিন্তু যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে প্যার, তোমাকে সম্পূর্ণ সুখী করিব।

না। আজ উহার পরিচয় বলিয়া যাই, তারপর চেষ্টা করি; যেদিন যাহা ঘটিবে, সেদিন তাহা তোমাকে বলিয়া যাইব। তবে চেষ্টা করিলে বাঘের চোখ মিলান যায়, এ আর কোন ছার। দেখি কি হয়।

পাপাচ্ছন্নবুদ্ধি. আমার স্বামী তাড়াতাড়ি পার্শ্বস্থ বাক্স

খুলিতে খুলিতে পুনরপি জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কই, তিনি কে আমাকে ত বলিলে না ?"

না। ঐ বাড়ীর যিনি মালিক তাহারই তিনি ভগিনী।

স্বা। সধবা না বিধবা ?

না। নামে সধবা, কাজে বিধবা।

স্বা। কি রকম ?

না। রকম এই যে, স্বামী থাকিলেও সাক্ষাৎ নাই, চির-বিরহিণী; স্বামীর বাড়ী তোমাদেরই ঐ বাঙ্গাল দেশে। তাঁহার পিতা কার্য্যোপলক্ষে সপরিবারে কলিকাতায় থাকিতেন, সেই সময় বিবাহ হয়। পিতৃবিয়োগের পর তাঁহারা দেশে চলিয়া যাইবার সময় উহাকে লইয়া যাইবার জন্ত ইচ্ছা প্রকাশ করেন, দূরদেশ বলিয়া উহারা পাঠান না। সেই সূত্রে উভয়পক্ষে মনোমালিন্ত ঘটে, তাঁহারা দেশে চলিয়া গিয়া দেশের একটী মেয়ের সহিত তাহার মাতা ছেলের বিবাহ দেন। তদবধি ইনি পরিত্যক্তা ও স্বামিসম্মিলনে বঞ্চিতা।

আমার স্বামী মহাশয় নিতান্ত মোহাচ্ছন্ন না হইলে নাপিতিনীর তখনকার মুখভাব দেখিলে, আর স্বরবিভঙ্গী শুনিলে বুঝিতে পারিতেন,—এতগুলি কথা নাপিতিনী একদমে মিথ্যা রচাইয়া বলিয়া ফেলিয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিল। কিন্তু তিনি বুঝিলেন, নাপিতিনী অসত্য কথা কেন বলিতে যাইবে? আমার অদৃষ্ট

চারিদিক দিয়া যেমন সুপ্রসন্ন এখানেও তাহাই ঘটিতেছে! বলিলেন,—"তবে ত বিশেষ সুবিধাই আছে, তুমি একটু চেষ্টা করিলেই আমার আশা পূর্ণ হইবে।"

না। না বাবু, কাজ তত সুবিধার নয়; মেয়েটি বড় ভাল, শিবপূজা না করে জল খায় না। দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি, সংসারে অনুরক্তি এবং ধর্ম্মের বই পড়াতেই আসক্তি—এমনটি আর কোথায়ও দেখা যায় না। রূপ ত অপ্সরার মত, কিন্তু সেদিকে কি ছাই লক্ষ্য আছে! বনফুল যেমন যত্ন করিয়া কেহ ফুটায় না, সময়ে সাজের বাতাসে আপনি ফুটিয়া সারা রাত্রি সে অনিচ্ছাতেও পথিকগণকে সুগন্ধদানে বিভোর করিয়া থাকে, ইনিও তাহাই করিতেছেন।

কথাগুলা আমার স্বামীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিয়া আর মনে মনে হাসিয়া বুঝি ভাবিল,—তোমার মত পাপাসক্ত উচ্ছৃঙ্খল যুবকের মুণ্ডপাত করিব।

আমার স্বামী নাপিতিনীর প্রকাশিত বাণীতে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। ব্যস্ততাসহকারে বলিলেন,—"কবে তোমার সঙ্গে আবার আমার দেখা হইবে?"

না। আজ যাই; চেষ্টা দেখি কতদূর কি করিতে পারি।

স্বা। চেষ্টা করিতেছ কি না আমি বুঝিব কি প্রকারে?

না। আমি মধ্যে মধ্যে আসিয়া খবর দিয়া যাইব। তবে

একথা তোমাকে বলিতে পারি, যে চেষ্টা করিলে নেহাত বিফল হইব না।

আমার স্বামী ততক্ষণে বাক্স হইতে দশ টাকার একখানি নোট বাহির করিয়া নাপিতিনীর সম্মুখে রাখিয়া দিয়া বলিলেন,—"এই যৎসামান্য আজ গ্রহণ কর। কার্য্য সমাধা করিয়া দিলে আমি তোমাকে নিশ্চয়ই খুসী করিব। বলিয়াছি ত,—এই কাজ আমার সফল করিয়া দিলে তোমার আর লোকের নখ চুল কামাইয়া খাইতে হইবে না।"

শয়তানী নাপিতিনী খাঁ করিয়া নোটখানি তুলিয়া নিজের অঞ্চলাগ্রে বাঁধিল। তারপর বলিল,—"বাবু টাকা কেন, টাকা কড়ির কথাই বা কেন, তোমার মত বড়লোকে আমাকে একটা সামান্য কাজের জন্য ধরেছে, আমি একটু চেষ্টা করব বৈ ত না? এসব ত আমাদেরই কাজ। আচ্ছা কাল বিকালে আসিয়া আমি দেখা করিব। কি হয় না হয় তাহার আভাষও দিয়া যাইব।"

স্বা। আমার প্রাণ তোমার হাতে রহিল।

নাপিতিনী উঠিয়া তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং রাজপথ ধরিয়া গম্ভীর চলনে চলিয়া গেল।

স্বামী আমার সেদিন কোন কাজেই ভাল করিয়া মনঃসংযোগ করিতে পারিলেন না। নূতন প্রেমের নূতন তুফানে পড়িয়া

'হাবুডুবু' খাইতে খাইতে আমাদের ব্যবসায়ের আড়তে গিয়াছিলেন বটে, কিন্তু নিতান্তই অমনোযোগী ও উদাসীন, কাজেই কর্ম্মচারিগণ আপন আপন সুবিধা বুঝিয়া যে যাহা সংগ্রহ করিতে পারিল, তাহা আপন আপন পকেটে পূরিয়া লইল।

ষোড়শ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

বীজ।

পরদিবস বৈকালে, যখন কলিকাতা মহানগরীর বক্ষঃস্থলের উত্তপ্ত বায়ু শীতল হইয়া আসিল এবং কর্ম্মশ্রান্ত মানবগণ আপন আপন আবাসস্থলে আশ্রয় লইতে ধাবিত হইল, আর নিষ্কর্ম্ম বিলাসিগণ বিলাসের পরিচ্ছদ পরিধানপূর্ব্বক আবাস হইতে বহির্গত হইয়া রাজপথে—কেহ গাড়ীতে, কেহ পদব্রজে গমনাগমন করিতে লাগিলেন, তখন আমার স্বামী মহাশয় তাঁহার সেই ক্ষুদ্র আবাস-কক্ষের সম্মুখস্থ সদর রাস্তায় দাঁড়াইয়া আকুল ও উদ্‌ভ্রান্তহৃদয়ে নাপিতিনীর আগমনাকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, সে কখন আসিবে ? এত লোক আসিল, এত লোক চলিয়া গেল, সে আসে না কেন, তবে কি আসিবে না ? প্রাণ ত আর স্থির থাকে না। কত স্থূলকান্তি, সুদীর্ঘললাট, শ্বেতবস্ত্রপরিধায়ী কমনীয় কান্তি, একান্তপ্রিয়দর্শন পণ্ডিতগণ চলিয়া গেলেন—কত স্থূলোদর উজ্জ্বলবর্ণ মধুর হাসিসংযুক্ত মোসাহেবপরিবৃত ধনিগণ বহুমূল্য যানারোহণে বায়ুবেগে গমনাগমন করিতে লাগিলেন—কত অবিরাম কর্ম্মক্লান্ত ঊর্দ্ধতন কর্ম্মচারী কেরাণীকুল ঘর্ম্মসিক্ত বসনে ধীর পদবিক্ষেপে বাড়ীর দিকে চলিয়া গেলেন। কত মুটে,
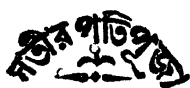
কত মেথর, কত কি নাম করিব? গমনাগমন করিল, কিন্তু তাহার অভাব ঘুচিল না কেন? তারপর আবও কি যায় নাই? গিয়াছে বৈ কি। কত সান্ধ্যফুল-কোরকবৎ সুন্দরী যুবতীও কেহ অশ্বযানে, কেহ দ্বিচক্রযানে চলিয়া গেল, অভাব ত পূরিল না। ক্রমেই সে আসিল না বলিয়া আমার স্বামীর মনে অভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল এবং অভাবের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি বড়ই কষ্ট অনুভব করিতে লাগিলেন।

এত আসিল গেল, তবু তাঁহার মনে আনন্দ হইল না কেন? তিনি যাহা খুঁজিতেছেন তাহা পান নাই বলিয়া। কিন্তু খুঁজিতেছেন কি? সেই নাপিতিনীকে না অন্য কিছু? আমরা নিশ্চয়ই বুঝিব অন্য কিছু; সেই সুন্দরী যুবতী। তাহাকে মিলাইয়া দিবে—তাহার সংবাদ বহন করিয়া আনিবে—তাহাকে পাইবার পথ বলিয়া দিবে—তাই নাপিতিনীর প্রয়োজন। কিন্তু নাপিতিনী তাহাকে দেখিয়াছে কি না, নাপিতিনীর সহিত তাহার আলাপ পরিচয় আছে কি না, সেই যুবতী তাঁহার প্রতি সদয় হইবে কি না এ সকল একবারও চিন্তা করিয়া দেখেন নাই। নাপিতিনীর কতকগুলি মিথ্যা প্রলোভন-বাক্যে প্রলুব্ধ হইয়া তিনি তাহার জন্য রাস্তায় দাঁড়াইয়াছেন, আমার স্বামীর তখনকার অবস্থার সহিত ধর্ম্ম-পিপাসু মানবগণের আর নাপিতিনীর সহিত ধর্ম্ম প্রচারক, গুরু বা পুরোহিতগণের তুলনা হইতে পারে না কি?

আশা পূরিল না—সে আসিল না। সন্ধ্যা তাহার ম্লান-ধূসর বস্ত্রাঞ্চলে প্রকৃতির মুখ ম্লান করিয়া দিবার ব্যর্থ চেষ্টায় কলিকাতায় নামিয়া পড়িল, কিন্তু কলিকাতার মানবগণ তাহা হইতে দিল না—আকাশের তড়িৎ মর্ত্তে আনিয়া তাহার আলোকে সে সন্ধ্যার অঞ্চলাচ্ছাদিত প্রকৃতির ম্লান মুখ আলোকিত করিয়াছিল। এতক্ষণ অবিচল ভাবে দাঁড়াইয়াও যখন নাপিতিনীর সেই শীর্ণ কঙ্কাল দেহের সেই দারিদ্র্য-দুঃখক্লিষ্ট দীর্ঘমূর্ত্তিকে দেখিতে পাইলেন না, তখন তিনি হতাশের দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া আবাস-কক্ষে ফিরিয়া গেলেন। আবাস-কক্ষে ফিরিয়া গিয়াও যখন তাঁহার প্রাণে স্থিরতা আসিল না—ধৈর্য্য ধরিল না, তখন তিনি বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্মস্থানে গমন করিলেন। কর্ম্মচারিগণ এখন তাঁহাকে দেখিয়া বড় ভীত হইত না—গ্রাহ্য করিত না, যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিয়া সমস্ত দিবসের কৃতকর্ম্মের নিকাশ দিত। তিনি ওসকল ভাল করিয়া শুনিতেন না, শুনিলেও সকল গ্রাহ্য করিতেন না। তহবিলদারের নিকট হইতে কিছু টাকা বাহির করিয়া লইতে পারিলেই তাঁহার দৈনন্দিন কর্ম্মের পরিসমাপ্তি হইত এবং অধ্যক্ষকে কর্ম্মের ভার দিয়া তিনি বাহির হইয়া পড়িতেন।

আজিও তাহাই করিলেন। সেখানে যাইয়াই কিছু টাকা চাহিয়া লইয়া চলিয়া গেলেন এবং প্রাণের জ্বালা জুড়াইবার জন্য অন্য নরকের দ্বারস্থ হইলেন। সেখানে গিয়া মদ্য পান ও পিশাচীর
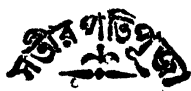
পৈশাচ বৃত্তিতে, আপনাকে অনেক্ষণ ডুবাইয়া—মজাইয়া রাখিয়া, অবশেষে নিশার্দ্ধকালে বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাকে এরূপ মূর্ত্তিতে দর্শন করিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত ও ক্ষুব্ধ হইলাম। মনে হইল, আমি যত আশাই করি, যত চেষ্টাই করি, ইহাকে কদাচ ফিরাইতে পারিব না। পাপের পথে যে পড়িয়াছে—যে চলিয়াছে, সে বুঝি ফিরিতেই পারে না।

অনেক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কোন কথা কহিতেই পারিলাম না। দুঃখে ক্ষোভে ও ঘৃণায় হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; তিনি গৃহমধ্যে আসিয়া নেহাৎ ভাল মানুষটির ন্যায় চলিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সক্ষম হইলেন না। উদরস্থ সুরা-বিষ তখনও পূর্ণরূপে ক্রিয়া করিতেছিল, তখনও তাঁহার গমনে পদস্খলিত হইতেছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, হাত পা কাঁপিতেছিল এক কথায় সর্ব্বাঙ্গ টলিতেছিল। কথা তখন জড়িত। তিনি সামলাইবার ব্যর্থ চেষ্টা করিয়া আমাকে বলিলেন,—আজকে অনেকগুলি পাইকের আসিয়াছিল, তাহাদিগের কাজ কর্ম্ম মিটা-ইয়া বিদায় করিতে একটু রাত হইয়া গিয়াছে। আর বকিয়া বকিয়া মাথাটাও একটু ধরিয়াছে। আমি কিছুই খাব না; শুইতে পারিলেই বাঁচি।

তাঁহার মুখভাব অত্যন্ত ম্লান। কথার স্বর কিঞ্চিৎ অনুতপ্ত। বুঝিলাম, পাপে তাঁহার পূর্ণাসক্তি থাকিলেও বিবেক শক্তিটা

একেবারে বিদূরিত হয় নাই। মুখ দেখিয়া, আর কথার স্বর-বিভঙ্গী শুনিয়া আমার মনে বড় দুঃখের সঞ্চার হইল। ভাবিলাম—হায়, অভাগিনী আমি,—যাঁহার আনন্দ স্থাপনই আমার জীবনের সার ও শ্রেষ্ঠকর্ম্ম, তিনি অনুতপ্ত হৃদয়ে আমার নিকট তাঁহার পাতক-রাশি ঢাকিবার জন্য আহারাদি না করিয়াই শয়ন করিতে যাই-তেছেন। যেহেতু জাগ্রত থাকিলে, আমার সহিত কথা কহিতে হইবে, চলিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে হইবে, আহারাদি করিতে হইবে, তাহাতে তাঁহার উদরস্থ সুরাবিষের ক্রিয়া প্রকাশিত হইয়া পড়িবে ;—আর শুইয়া পড়িতে পারিলে, এ বিষে এখনই তাঁহাকে অজ্ঞান করিয়া ফেলিবে, আমি ধরিতে পারিব না। আমি বলি-লাম,—"দেখুন মানুষ যখন পাপের আগুন জ্বালিয়া বসে, তখন সে ভাবে, এ আগুনের তাপে আমি তপ্ত হইতেছি, কিন্তু অপর কেহ এ তাপে সহজে তপ্ত হয় না,—আর চেষ্টা করিয়া চলিলে হয়ত কেহ জানিতেই পারে না! তা নয় প্রভু ;—যে যাহাকে লইয়া বাস করে, সে তাহার সমস্ত খুঁটিনাটিই ধরিতে পারে—বুঝিতে পারে। বিশেষতঃ হিন্দুরমণী তাহার স্বামীর প্রতিলোমের ঘর্ম্মবিন্দু প্রতি পদক্ষেপের চরণ-ঝরা ধূলিকণা,—প্রতি কার্য্যের নিশ্বাসের লেশটুকু পর্য্যন্ত দেখিতে ও বুঝিতে পারে। আপনি আমাকে যাহা লুকাইবার চেষ্টা করিতেছেন—যে পাপের আগুন কোচার কাপড়ে ঢাকিয়া রাখিবার আগ্রহ প্রকাশ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে আমার কিছু
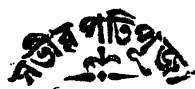
মাত্র বাকী নাই। আপনার দোষ দেখি না—আপনি দোষী নহেন—আমারই কপালের ফেরে, আমারই কর্ম্মের ফলে আপনার এই দুর্ম্মতি। না খাইয়া আর কষ্ট পান কেন? একে মহাবিষে শরীর বিদগ্ধ, তার উপরে অনাহারে শরীর কদিন টিকিবে।

স্বামী রাগিয়া উঠিলেন। যে যখন পাপ করে, তাহাকে তখন পাপের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও তাহার রাগ হয়। তাঁহার হৃদয়ে যদিও তখন শৈবালবদ্ধ, মৃত নদীর বক্ষঃস্থলস্থিত ক্ষীণ স্রোতের ন্যায় বিবেকের একটু ক্ষীণ প্রবাহ চালিত হইতেছিল, কিন্তু আমারই এই কথায় যে ক্রোধের উদ্ভব হইল, তাহাতে তাহা একেবারেই দূর হইয়া গেল। রজোগুণ পূর্ণরূপে জ্বলিয়া উঠিল। মদ-বিহ্বল যে চক্ষু নত ছিল, তাহা উর্দ্ধে উত্থিত হইল এবং রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ক্রোধকম্পিত-স্বরে মদবিজড়িত ভাষায় আমাকে বলিলেন,—'দেখ, মেয়ে জেঠা আমার দুই চক্ষুর শূল! তেমনি আমার কপালে তুমি একটি অখণ্ড জেঠা মহাশয় জুটিয়া গিয়াছ। সত্য বলিতে গেলে, আমার এ অধঃপতনের বার আনা দোষ তোমার। স্পষ্ট কথা বলিতে গেলে, বলিতে পারি,—তোমার নিকট আসিলে আমার কোনরূপ আনন্দ না হইয়া বিরক্তি হইয়া থাকে। কাজেই আমাকে সমস্ত দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত জীবনের একটু শান্তির জন্য অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয়। একটানা কর্ম্মক্লান্ত জীবনের শান্তির জন্য কমা, সেমিকোলেন চাই বৈ কি। যাহার

মনোরমা ও হৃদয়ের অনুবৃত্তি-অনুসারিণী ভার্য্যা হয়, সে কমা সেমিকোলনের জন্য অপরের দুয়ারস্থ হইবে কেন? সমস্ত দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত জীবন লইয়া গৃহে ফিরিলেই পূর্ণ শান্তি পাইয়া থাকে। আর আমার মত যে হতভাগ্যদের তোমার মত জেঠা মহাশয় স্ত্রী হয়, কাজেই তাহাদিগকে এইরূপ পাতকের পিচ্ছিল পথে যাইতে হয়।

আমার বড় দুঃখ হইল, মনে হইল, হায়! আমি মরিনা কেন? তিনি যদি আমার নিকটে আসিলে তাঁহার কষ্ট হয়, তবে আমার বাঁচা কেন? নারীদেহ ধারণ করা কেন? বুঝিলাম, তাঁহার মনের বৃত্তি ও আমার মনের বৃত্তি এক নহে। তিনি ঠিক বলিয়াছেন, মনের বৃত্তি-অনুসারিণী ভার্য্যা না হইলে, মানুষ সুখী হইতে পারে না। তিনি মদ্যপান করিয়া ঘরে আসিতেন, আর আমি যদি বানরীর মত হাসিয়া তাঁহাকে বানরের মত নাচাইয়া— অশ্লীল ভাষায় রহস্য করিয়া মন যোগাতে পারিতাম,—তাহা হইলে, হয়ত বা তিনি আমার নিকটে আসিয়া সুখী হইতে পারিতেন। আমি হতভাগিনী যে তাহা পারি না, আমার প্রাণের আশা, আমার স্বামী-দেবতা যখন সমস্ত দিবসের গার্হস্থ্য-যজ্ঞের কর্ম্ম হোমের মহাব্যাহৃতির শেষ আহুতি হইয়া আমার অনুসন্ধানে আসেন, আমি তখন সহস্রধারার শীতল সলিলে—ছিদ্র-কুম্ভে সমানীত যমুনাজলে স্নান করাইয়া প্রেম ভক্তির সোমরস পান
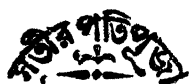
করাইয়া আত্মবিসর্জ্জনের সমস্ত তত্ত্বমঞ্চে শয়ন করাইয়া রাখি। আমি কেন তাঁহার সুখ পূরণের জন্য আমার আশা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার আশা পূর্ণ করিবার জন্য, আমার হৃদয়-বৃত্তি গুলিকে ধ্বংস করিয়া ফেলিলাম না, কেন তাঁহার মনোবৃত্তির অনুসারিণী হইয়া বানরী সাজিয়া, বানরের মত নাচাইয়া সুখী করি না? স্বহস্তে মাংস পাকাইয়া মদ ঢালিয়া তাঁহাকে ভোজন করাই না? হারমোনিয়ম বাজাইয়া অশ্লীল গানের উচ্চ সুরের প্রতিধ্বনিতে সমস্ত গৃহ কাঁপাইয়া পৈশাচিক নৃত্যের তাণ্ডব নর্ত্তনে তাঁহার মদবিহ্বল দৃষ্টির আনন্দবর্দ্ধন করিবার চেষ্টা করি না। তাহাতে এককথায় তাহার কুকর্ম্মের সহায় হইয়া তাহার সহিত প্রেতপুরের পতিত প্রমোদকক্ষে বিচরণ করিয়া তাঁহাকে সুখী করিলে তিনি যদি সুখী হইতে পারেন, আমার তাহা করিতে দোষ কি?

উন্মুক্ত জানালাপথে সমাগত সমীরণ যেন হো, হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, আমার প্রতি ঘৃণা ও অবজ্ঞার ভাব প্রকাশ করিল। আকাশে চাঁদ হাসিল ;—তারাকুল ম্লান মুখে যেন আকাশের নীলচাদরে মুখ গুঁজিল, কেহ কক্ষচ্যুত হইয়া কক্ষান্তরে চলিয়া গেল, কেহ মেঘখণ্ডকে ডাকিয়া তাহার মধ্যে লুকাইয়া পড়িল। দিগ্‌বালা ম্লান মুখে যেন ডাকিয়া বলিল,—তুমি না হিন্দুর মেয়ে! তোমার হৃদয়ে না দেবকুমারীর অমিত তেজোরাশি সর্ব্বদা সুসজ্জিত, তুমি না স্বামীদেবতার তুষ্টির জন্য সর্ব্বদা বলির পশু লইয়া বসিয়া

আছ? একি ভ্রান্তি! স্বামীর সুখ কাহাকে বলিতেছ? পাপে সুখ, তোমার মনের কাছে এই নূতন শুনিলাম। স্বামীর অসৎপথের সাহায্যকারিণী হইয়া তাঁহাকে সুখী করিবার জন্য হিন্দুর মেয়ের জন্ম নয়। হিন্দুর মেয়ে সহচারিণী নহে,—সহধর্ম্মিণী; ধর্ম্ম কার্য্যে সহায়তা করিবে, পাপে নহে। তিনি যখন পাপের পথে চলিতে থাকিবেন, তখন পশুরক্ত দানে তাঁহাকে ফিরাইতে হইবে। সে সন্ধান কি তুমি পাইতেছ না।

আমি মুগ্ধ হইয়া এই সকল কথা শুনিতে লাগিলাম। হঠাৎ আমার স্বামীর ক্রোধোত্তেজিত স্বরে সে ধ্যান ভাঙ্গিয়া গেল। তিনি তখন বলিতেছিলেন,—"তোমার ও বক্তৃতা রাখিয়া দাও। আমার বিছানা কৈ? আমি শোব।"

আমি চাহিয়া দেখিলাম তাঁহার অবস্থা তখন আরও খারাপ হইয়াছে। মস্তক ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং কথা খুব জড়াইয়া গিয়াছে। সুরাবিষের ক্ষণিক উত্তেজনা অপনোদিত হইয়া অবসাদ অবস্থা আসিয়া পড়িয়াছে। আর বসিবার উপায় নাই। আমি তাড়াতাড়ি উঠিলাম, তাঁহাকে তাঁহার গাত্র হইতে গাত্রবস্ত্রাদি উন্মুক্ত করিতে অনুরোধ করিলাম, তিনি জামা কাপড়াদি খুলিতে গেলেন, কিন্তু পারিলেন না; তখন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল, চেষ্টা করিয়াও গায়ের জামা কাপড় খুলিতে পারিলেন না এবং বসিয়াছিলেন সেই মেঝের উপর ঢলিয়া পড়িয়া গেলেন।

দেখিলাম কপাল ঘামিয়া—সর্ব্বাঙ্গ ঘামিয়া তাঁহার পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিজিতে আরম্ভ করিল। তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িলে আমার অত্যন্ত ভয় হইল, একবার ভাবিলাম চীৎকার করিয়া বাড়ীর অপর লোকদিগকে ডাকি, আবার মনে হইল, তাঁহার মুখের মদ-গন্ধ ও এই অবস্থা তাঁহার পৈশাচিক কার্য্যের সাক্ষিস্বরূপ হইয়া সকলকে তাঁহার এই কুকার্য্য জানাইয়া দিবে—সকলেই তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিবে। তাহা পারিলাম না, অনন্যগতি হইয়া তাঁহার জামার কাপড় ছিঁড়িয়া ফেলিয়া খুলিয়া দিলাম। তারপর অনেক-ক্ষণ পাখা টানিয়া বাতাস করিলাম। গায়ের ঘাম বন্ধ হইয়া গেলে, পেটে হাত দিয়া দেখিলাম তাহা সম্পূর্ণ খালি। তখন রক্ষিত খাবার হইতে কিছু আনিয়া খাওয়াইবার জন্য যথোচিত চেষ্টা করিলাম। কিন্তু পারিলাম না। তখন সেগুলি দূরে ফেলিয়া দিয়া পুনরপি বাতাস করিতে লাগিলাম। তার পর বিছানায় তুলিয়া শয়ন করাইবার শত চেষ্টাতেও সক্ষম হইলাম না। টানা-টানিতে তিনি মেঝের দিকে আরও সরিয়া আসিয়া হাত পা ছড়াইয়া দিলেন। আমি ব্যস্ত হইয়া তাঁহার মাথায় কিছু জল থাবাইয়া দিলাম এবং বন্যভাবে পাখা টানিয়া মাথায় হাওয়া দিতে লাগিলাম। অল্পক্ষণ পরেই নাসিকা গর্জ্জিয়া উঠিল। সে গর্জ্জনে বুঝিতে পারিলাম, সবিশেষ ভয়ের কারণ আর নাই,—ঘুম আসিয়া পড়িয়াছে।

তখন রাত্রি বড় অধিক ছিল না। উন্মুক্ত জানালাপথে দেখিলাম শুক্লা দশমীর চন্দ্র, আর আকাশে নাই,—অস্তমিত হইয়াছেন। তিনি মেঝেই পড়িয়া গড়াগড়ি যাইতে লাগিলেন, আর আমি কোন্ সুখে পালঙ্কে যাইয়া শয়ন করিব,—কাজেই তাঁহার পায়ের তলার দিকে মেঝের এক পার্শ্বে শুইয়া পড়িলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই সর্ব্বদুঃখবিনাশিনী, সকল সন্তাপহারিণী নিদ্রার ক্রোড়স্থা হইলাম।

সপ্তদশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

পরদিবস পূর্ব্বাহ্ণে স্বামী আমার সহিত বড় অধিক কথা বার্ত্তা কহিলেন না। নিতান্ত সাংসারিক কথা যা না বলিলে চলিবার সম্ভব নয়, সেইরূপ দুই একটি কথা বলিয়া স্নানাহার করিয়া তিনি কর্ম্ম-স্থানে চলিয়া গেলেন। সেখানে গিয়াও কোন কার্য্য করেন নাই। কর্ম্মচারীদিগের উপর কয়েকবার অযথা ধমক দিয়া অবশেষে তাহাদিগের নিকট নিজের অসুখ জ্ঞাপন করিয়া সেই ভাড়াটিয়া কক্ষে গমন করিলেন। সেখানে গিয়া নাপিতিনীর আগমনকাঙ্ক্ষার হৃদয় লইয়া পুনঃ পুনঃ পথপানে চাহিতে লাগিলেন। কখনও বা উত্তর দিকের জানালা ঈষদুন্মুক্ত করিয়া সেই সুন্দরীর দর্শনাকাঙ্ক্ষ-প্রাণে চক্ষু দুইটাকে স্থির করিয়া সমস্ত দৃষ্টিটুকু তাঁহাদের বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করাইতেছিলেন। কিন্তু কোন দিকেই কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া, তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতে লাগিল! পুনঃপুনঃ এইরূপ উদ্বেগাকুল দৃষ্টিতে সন্ধান করিয়াও যখন তাহাদিগের পদাঙ্গুলিটুকুও তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল না, তখন অগত্যা বড় কষ্টে শয্যায় শায়িত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু হৃদয়ে শান্তি মিলিল

না,—শয়নে সুখ হইল না; উঠিয়া বসিলেন। দূরে ক্ষুদ্র এক-খানি টেবিলের উপর ছিন্নপত্র বটতলার মুদ্রিত কাশীদাসী মহাভারত একখানা পড়িয়াছিল, তাহাকে টানিয়া আনিয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন। গোটা একটি পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াও যখন তাহার অর্থ বোধ করিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে যথাস্থানে ছুড়িয়া ফেলিয়া রাখিলেন। আবার জানালা টানিয়া ঈষদুন্মুক্ত করিলেন, এইবার আশা পূরিল—তাঁহার বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা কাঁপিয়া কাঁপিয়া আছাড় খাইতে লাগিল, শিরাগুল্যা নাচিতে লাগিল, পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত তড়িৎ-বেগ বিচ্ছুরিত হইতে লাগিল। তিনি দেখিলেন,—"রমণীর গৃহকক্ষের দ্বারের একখানি কপাট খোলা, সে খোলা দ্বারের কাছে নাপিতিনী যাহার সহিত কথা কহিতেছে,—তাহার অতসীকুসুমবর্ণ মৃণালকোমল একখানি হস্ত দুইবার ঈষৎ অগ্রসর হইয়া প্রায় নাপিতিনীর কাছে আসিল। কিন্তু কেন আসিল তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। না পারুন, তথাপি বিশেষরূপে বুঝিতে পারিলেন—নাপিতিনীর সহিত তাঁহার মনোহারিণীর নিশ্চয়ই গোপন পরামর্শ হইতেছে। তখন তিনি তাড়াতাড়ি আপন গৃহের জানালা বন্ধ করিয়া টেবিলের সন্নিকটস্থ চেয়ারে গিয়া উপবেশন করিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ পথপানে চহিতে লাগিলেন; মনে আশা—শীঘ্রই নাপিতিনী আসিয়া তাঁহাকে দেখা দিবে।

আশা পূরিল;—আধঘণ্টা অতীত না হইতেই নাপিতিনী

তাহার গৃহদরজায় উপস্থিত হইয়া ডাকিয়া বলিল,—"বাবু ঘরে আছেন নাকি গো?"

স্বামী মহাশয় ব্যস্তভাবে ডাকিয়া বলিলেন—"এস, এস, আছি বৈ কি!" দরজা ভেজান ছিল, ঠেলিয়া নাপিতিনী গৃহে প্রবেশ করিল এবং পুনরায় দরজা ভেজাইয়া দিয়া বাবুর নিকটস্থ হইল। বাবুর আর সহ্য হয় না, তাহার মুখের দিকে জিজ্ঞাসুনয়নে স্থির-দৃষ্টি সম্বদ্ধ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কাল আসবার কথা ছিল, আসিলে না কেন? আমি সমস্ত বিকাল হইতে রাত্রি প্রায় নটা পর্য্যন্ত এই ঘরে একাটি তোমার দিকে চাহিয়া কাটাইলাম। তুমি আসিলে না কেন?"

সংসাররসাভিজ্ঞা পাপকর্ম্মচতুরা নাপিতিনী বুঝিল, পাখী জালে জড়াইয়াছে, আর উড়িবে না; বলিল—"তা আমি বুঝেছিলুম বাবু;—কিন্তু কাল আমার বড় বিপদ্ গিয়েছে, সেই জন্য কোন কাজ করতেই পারিনি, আস্তেও পারি নি।"

বা। তোমার বিপদ্! এমন কি বিপদ্ গো?

না। সে কথা তোমায় বলে কি করবো বাবু! তবে তোমার কাছে যখন একাজ করবো বলে কথা দিয়েছি, তখন ফাঁকে-জোঁকে তারও চেষ্টা দেখবো; কিন্তু কাজ যে রকম কঠিন দেখ্‌ছি, তাতে এমন ভাবে কাজ কল্লে যে শীগ্‌গির তোমার মনের আশা পূর্ণ হবে, তাও বলতে পারি না।

বা। থাক, আমার কাজের কপালে যা থাকে তাই হবে; তোমার বিপদ্ কি আগে তাই বল?

না। বলিতেছি ত, আমার বিপদের কথা তোমায় বলে কি কোর্‌বো!

বা। ওই চেয়ারটার উপর বস, স্থির হও; বল যদি সে বিপদ্ কোন রকমে দূর করিতে পারি, তার চেষ্টা দেখবো। তুমি আমার বিপদ্ দূর করিবার জন্য যখন ছুটিয়া বেড়াইবে, তখন আমি তোমার বিপদ্ নিবারণের চেষ্টা না করিলে হইবে কেন?

নাপিতিনী বুঝিল, জালেপড়া পাখী মরিবার মতই হইয়াছে, মনে মনে হাসিল, মনে মনে বলিল, আগে আমার কাজ আমি নিজে যতদূর পারি সারিয়া লইব, তারপর অপরের সহিত যোগ দিয়া তোমার সর্ব্বনাশ করিতে হইবে, তোমাদের মত ধনী—বাঙ্গাল—কাপ্তেন না পাইলে, আমাদের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হয় না। যৌবন কাল হইতে অনুসন্ধান করিয়া মিলাইতে পারি নাই, এখন বিধি যদি নিধি মিলাইয়াছেন, সহজে পরিত্যাগ করিতে পারিতেছি না। ধীরে স্থিরে তোমার হাড় মাংস চিবাইয়া খাইতে হইবে।

বাবুর মুখের দিকে চাহিয়া করুণস্বরে বলিল—"তুমি খুব দয়ালু মানুষ বলে বোধ করিছি বাবা। বড় লোকের ছেলে, না হবে কেন, তোমার হাত ঝাড়লে বোঝা। আমি তোমার মার

বয়সি যদি ঘৃণা না হয়, দাসীকে মাসী বলিতে যদি অপমান জ্ঞান না কর, তবে আমাকে আজ থেকে মাসী বলে ডেকো। কলিকাতার বড়লোকেরা বাড়ীর নাপিতিনীকে প্রায়ই নাপিত মাসী বলে ডেকে থাকে। তা খুড়োরও মাসী, ভাইপোয়েরও মাসী ছেলেরও মাসী; আবার শাশুড়ীরও মাসী, বউয়েরও মাসী নাতনীরও মাসী। হালিনী, গোয়ালিনী, নাপিতিনী এরা সাত পুরুষে মাসী—বারোয়ারী মাসী।

বা। আমিও তাই ভাবিয়াছিলাম—তোমাকে কি বলিয়া ডাকিব। যাক্, এখন তোমার কি বিপদ্ বল।

না। আমার এক ভাই পো আছে জান্‌লে, ভাইপোটির একটু বারটান আছে। ত্রিসংসারে আমার আর কেও নেই বাবা, আমি যা কামিয়ে আনি, সে তাই দিয়ে নেশা ভাঙ্গ করে, খেলিয়ে বেড়ায় পাড়ার হতভাগাদের তা চক্ষুঃশূল হয়ে উঠ্‌ল,—জান্‌লে, তাদের পরামর্শে কামাতে পাঠালাম, সে তা পারে না; তখন এক বড় মানুষের বাড়ী চাকুরী করতে পাঠালাম, জান্‌লে, সেখানে নাকি তাদের কি গহনা চুরি করে পোদ্দারের দোকানে বেচ্‌তে গিয়ে ধরা পড়ে, জেলে যায়—পুলিশ, হাঙ্গামা হয়েছে; এখন পুলিশকে দুশ টাকা ঘুষ না দিলে ছেড়ে দেয় না। আমি মোটে কুড়ি টাকা যোগাড় করেছি, তাও যে আজ দিলে কাল খাওয়া বন্ধ হবে। সে যা কপালে থাকে তাই ঘটবে, কিন্তু বাকী টাকা কোথায়। ভদ্র

লোকের মেয়ে—যাঁদের আমি কামিয়ে থাকি, তাঁদের দুয়ারে কাল-থেকে ঘুরচি—সকলেই দুটাকা একটাকা করে দিয়েছে, আর যাকে তুমি ভালবেসেছ, তিনি তোমারি মত দয়ালু, কিন্তু তিনি কোথায় পাবেন,—জান্‌লে, তবু দয়ার শরীর; আমার দুঃখে কাঁদ কাঁদ হয়ে বললেন, আমার থাকলে আমি সব দিতুম। নাই, কোথা থেকে দিব নাপিত মাসী, এই কুড়ি টাকা সম্বল আমার আছে, নে যাও নাপিত মাসী। সব কুড়িয়ে বুড়িয়ে জান্‌লে বাবা, পঞ্চাশ টাকা জমেছে, দেড়শ টাকা বাকী। কোথায় যাব বাবু, কি করি বাবু, বনপোড়া হরিণীর মত কাল থেকে ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছি।

বা। এই! এরই জন্তে এত? কাল তখনই কেন আমার কাছে আসিলে না? সব চুকিয়া যাইত।

না। জান্‌লে বাবা, তা মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু কেবল ভয় আর লজ্জা এসে বুকটাকে আচ্ছন্ন করে ধরলো, পেরে উঠলাম না মনে হল, এখনও ভাল করে আলাপ পরিচয় হয় নি, আমি কি ধাতের মানুষ তা তিনি জান্‌তে পারেন নি—তাঁর কাজেরও কিছু আন জ্ঞান করতে পারিনি। এখনই টাকার কথা বল্‌লে পাছে আমাকে ঘৃণা করেন।

বা। ওমা! সে কি? বিপদে পড়ে জানাবে তার আবার কথা! যাক্‌, আর কাহারও টাকা লইতে হইবে না, আমি টাকা দিতেছি। এখন আমার কাজের কি কর্‌তে পেরেছ বল?

না। ওগো সে অবিচল পাহাড়, ধর্ম্মের পথ কিছুতেই ছাড়তে চায় না। অনেক করে কাতরে বলায় এবং তোমার রূপগুণের অনেক প্রকার বর্ণনা করায়—বলেছে, আজ বিকালে তাদের ছাদে উঠে তোমায় দেখ্‌বে, তুমি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটে * * জায়গায় বিকালে গিয়ে দাঁড়াবে, আমি তার সঙ্গে থাক্‌বো।

বা। ঠিক কটার সময় বল ত মাসী?

না। আমি কি অত বুঝি বাবা;—তবে সন্ধ্যে হয় হয় এমন সময় যেও, আমি এসময় তাকে নিয়ে ছাদে উঠ্‌বো।

অজ্ঞানান্ধ স্বামী আমার সেই চরিত্রহীনা মিথ্যাবাদিনীর মিথ্যা কথায় ও ছলনায় ভুলিয়া গেলেন; বাক্স হইতে দশ টাকার হিসাবে কুড়ি খানি নোট বাহির করিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে অম্লান বদনে তাহাকে প্রদান করিলেন। সে হস্ত প্রসারণে সে গুলিকে লইয়া তলপেটের বস্ত্রাগ্র ভাগে বাঁধিয়া গুঁজিয়া লইল। তার পরে বলিল—"বাবা তোমার জয় হোক, নক্ষ্মী লাভ হোক, তোমার কাজ সমাধা করে দিই, তুমি মনের আনন্দে তাকে লয়ে বাস কর। আর দেরী করবোনা, জান্‌লে পুলিশ হাঙ্গামা কথা ভাল নয়, মিটিয়ে দেই গে। বিকেলে ওখানে যাব, সন্ধ্যের পর এসে সাক্ষাৎ করে যা হয় আবার জানিয়ে পরামর্শ কোরবো।

বা। দেখো মাসী ভুলো না। আমার প্রাণ তোমার হাতে রহিল। আমি তোমারই ভরসায় জীবন রাখিতে সক্ষম হইতেছি।

নাপিতিনী হর্ষচিত্তে হাসি মুখে ঘরের বাহির হইয়া চলিয়া গেল ! আমার স্বামীরও হৃদয় তখন বড় উৎফুল্ল;—বড় আনন্দ—বড় উত্তেজনা লইয়া বুকের মধ্যে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল। এখনই কি করিয়া তিনি সেই মুহূর্ত্তেই দর্শন দিয়া সেই যুবতীকে ভুলাইয়া ফেলিতে পারিবেন—কিরূপ রূপলাবণ্যের রজ্জুতে ফাঁস পরিয়া রাস্তা হইতে তাহাদের প্রাসাদশীর্ষে তুলিয়া সেই যুবতীর গলায় পরাইয়া দিয়া তাহাকে নামাইয়া লইতে পারিবেন, কিরূপ প্রসাধনে অঙ্গ প্রসাধিত করিলে তাঁহাকে দেখিবা মাত্র সেই যুবতী ধড়ফড় করিতে আরম্ভ করিবে, একমাত্র সেই চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি তখনই একখানি অতি সুগন্ধ ও মূল্যবান্ সাবান বাহির করিয়া লইয়া স্নানার্থী হইয়া জলের কলের কাছে গমন করিলেন, এবং অন্ততঃপক্ষে দুই ঘণ্টা ধরিয়া সাবান মাখিয়া গামছা ডলিয়া যেখানে যাহা ছিল, তুলিয়া মাজিয়া ঘষিয়া যতক্ষণ তাঁহার মনের তৃপ্তি না হইল ততক্ষণ স্নান করিলেন। তারপর সুগন্ধি তৈল মাখিয়া পুনরপি স্নান করিয়া ধৌত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক সেই গৃহের দরজাদি বন্ধ করিয়া কর্ম্মস্থানে চলিয়া গেলেন। সকল দিন মধ্যাহ্নভোজন করিতে বাড়ী আসিতেন না, যে দিন কাজের ভীড় থাকিত সে দিন আড়ংএ বাড়ীতেই মধ্যাহ্নভোজন করিতেন। আজিও তাহাই করিলেন, কিন্তু আড়ঙের কার্য্যে কিছুমাত্র মনঃসংযোগ করিলেন না। সে কার্য্যে তাঁহার সেখানকার ক্ষতি

বুদ্ধিতে তাঁহার যে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি আছে, এমন কেহ বুঝিল না। আহারান্তেই একশত টাকা পকেটে পূরিয়া লইয়া তিনি আড়ৎ হইতে বাহির হইলেন, এবং রাস্তায় বাহির হইয়া একখানি ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া লইয়া একদম ক্যানিং ষ্ট্রীট্ বা মুর্গীহাটায় গমন করিলেন। সেখানে গিয়া প্রথমেই চেরিব্লসম্ সাবান এক বাক্স ক্রয় করিলেন; তারপরে রিগর্ডের এক শিশি লেবেণ্ডার, পাইভারের ইউডিকলম, রিমেলশের বকুল, ভিক্টোরিয়া বোকে এসেন্স ও ড্যামেল রোজ এক শিশি সংগ্রহ করিলেন। তারপর সরু মোটা মাঝারি তিন রকমের তিন খানি চিরুণী ও উৎকৃষ্ট আয়না একখানি ক্রয় করিয়া লইয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চৌরঙ্গী অভিমুখে চলিয়া গেলেন। সেখানে উপস্থিত হইয়া প্রথমেই হোয়াইট ওয়ের বিপণীতে প্রবেশ করিলেন। সেখানে গিয়া তিন রকমের এক ডজন রুমাল, এক ডজন গেঞ্জি, এক ডজন সার্ট, ও একটি অতি সুন্দর সিল্কের পাঞ্জাবী ক্রয় করিলেন। তার পরে ভেল্‌ভেটের জুতা ও মনের মত মোজা কিনিয়া লইয়া গাড়ীতে চাপিয়া তাঁহার সেই বাসকক্ষের দিকে গাড়ী চালিত করিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, চৌরঙ্গীর এক সাহেবী দোকান হইতে এক বোতল বিলাতী সুস্বাদু সুরা ক্রয় করিয়া লইতেও বিস্মৃত হন নাই। কারণ, ধারণা ছিল সামান্য একটু সুরা সেবন না করিলে যত সুন্দর বস্ত্রাদি মানুষ পরিধান করুক তাহার অঙ্গদ্যুতি বিকশিত হয় না। সামান্য

পরিমাণ সুরা সেবনে মানুষের চক্ষু কেমন ঢুলু ঢুলু হয়, গণ্ডদ্বয় রক্তবর্ণ ধারণ করে, আর সর্ব্বাঙ্গে বুঝি চাঁদের কিরণ ঝরিতে থাকে। বাসায় ফিরিতে তিনটা বাজিয়া গিয়াছিল।

তিনটা বাজিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মন অত্যন্ত উচাটন হইয়া পড়িল; মনে হইল—আর মোটে তিন ঘণ্টা সময়, এত অল্প সময়ের মধ্যে কি করিয়া তিনি প্রসাধন কার্য্য শেষ করিয়া বাহির হইতে পারিবেন। দিনটা তাঁহার সঙ্গে আড়ি জুড়িয়া দিয়াছে; অন্য দিন, দিন আর কাটে না, আজ যেন সে উচ্চৈঃশ্রবার গতি পাইয়া বসিয়াছে। এখনও যে তাঁহাকে পরিধানের কাপড় আনিতে সেই জোড়াসাঁকো ছুটিতে হইবে। যদিও হ্যারিসন রোডে দুই একখানি দোকানে দেশী কাপড় কিনিতে মেলে, কিন্তু জোড়া-সাঁকোর মত তেমন কাচা—তেমন বাবু-পসন্দ দেশী কাপড় আর কোথায়?

তিনি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাঁহার ক্রীত জিনিষগুলি শয্যার উপর রক্ষা করিলেন। তারপর পকেটে হাত দিয়া তহবিলে অবশিষ্ট কি আছে বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন,— মোটে তের আনা এক পয়সা আছে। তখন বাক্স খুলিয়া আর দশ টাকা করিয়া দুই খানি নোট লইয়া ঘরের বাহির হইলেন এবং তাড়াতাড়ি বড় রাস্তায় গিয়া ট্রামে চাপিয়া জোড়াসাঁকোয় চলিয়া গেলেন। যখন তিনি বাজার করিয়া গাড়ী হইতে নামেন

তখন এক কোকেন খোর দুষ্ট যুবক তাঁহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ছিল। তিনি জিনিযগুলি গৃহে রাখিয়া চলিয়া গেলে সে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিল পাশাপাশি তিন চারিটী ঘরই তখন তালা দিয়া আবদ্ধ করা। হয়ত আমার বলিতে ভুল হইয়া থাকিবে, ঐ বাড়ীর প্রত্যেক ঘরগুলি পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি ভাড়া লইয়া,—কোন গৃহে একজন, কোন গৃহে দুইজন, কোন গৃহে বা চা'র জনও বাস করিয়া থাকে। সকলেই বাহিরে চাকুরী বা ব্যবসা করে। কেহ হোটেলে খায়, কেহ মনিবের বাড়ী খায়, কেহ বা নিম্ন তলের ক্ষুদ্র রন্ধনগৃহে স্বহস্তে রাঁধিয়া খাইয়া দশটার পূর্ব্বেই চলিয়া যায়। সে বাড়ীতে--সে সকল গৃহে কাহারই মূল্যবান্ বস্ত্র, অধিক টাকাকড়ি বা মূল্যবান্ অলঙ্কারাদি থাকে না। সে বাড়ী দশজনের বলিয়া সর্ব্বদাই তাহার বহির্দ্বার উন্মুক্ত থাকিত।

দুষ্ট কোকেনখোর যুবকের পকেটে চারি পাঁচটি চাবি ছিল, সে পর পর দুই তিনটী দিয়া খুলিবার চেষ্টা করাতে একটি দিয়া খুলিয়া গেল। তখনই সে ধাঁ করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া আমার স্বামীর দ্বিপ্রহর রৌদ্রের দারুণ কষ্টসঞ্চিত মনের মত ব্যসনের দ্রব্যগুলি তাঁহারই একখানি পুরাণ কাপড় টানিয়া লইয়া ভাঁজ করিয়া তাহাতে বাঁধিয়া ফেলিল; তার পর খুব ত্বরিতগতিতে তাঁহার হাতবাক্সটি পকেট হইতে একখণ্ড লৌহ বাহির করিয়া তাহার টানে ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দেখিল, বাক্সে টাকা বড়

অধিক নাই—গুটি চল্লিশেক আছে, তাহা লইয়া পকেটে পূরিল; তারপরে ঐ পুঁটলি হস্তে ধাঁ করিয়া গৃহের বাহির হইল এবং কোন্ পথ দিয়া কোথায় চলিয়া গেল তাহা কে ঠিক করিয়া রাখিবে? সে বাড়ী তখন জনশূন্য, সকলেই আপন আপন কার্য্য করিতে বাহির হইয়া গিয়াছে, পাঁচটার পর হইতে পুনরাগমন করিতে থাকিবে।

অষ্টাদশ উচ্ছ্বাস।

—•:*:•—

বৃক্ষ।

স্বামী মহাশয় জোড়াসাঁকোয় উপস্থিত হইয়া পাল ব্রাদার্সের দোকান হইতে এক জোড়া ফরাশডাঙ্গার রজক-ধৌত বস্ত্র সাড়ে সতর টাকা দিয়া ক্রয় করিলেন, এবং ঘড়ির দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সাড়ে তিনটা বাজে;—বুঝি তাঁহার শুভ দর্শনের ক্ষণ লগ্ন মুহূর্ত্ত এখনই আসিয়া চলিয়া যাইবে, আর তাঁহাকে ডাকিয়া কখন ফিরান যাইবে না; তাই সময়ের প্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া ক্ষুন্ন মনে উঠিয়া দাঁড়াইলেন! দুইখানি নোট দিয়াছিলেন, দোকানদারের নিকট হইতে তখনও বাকী আড়াই টাকা ফিরাইয়া পান নাই। তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল আড়াই টাকা ফেলিয়াই চলিয়া যান। দোকানদারের ঘরে নোটের টাকা ছিল না, তিনি একখানি নোট পার্শ্বের দোকানে ভাঙ্গাইতে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। বাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—"কৈ মহাশয়, এখনও যে আসিল না। সময় যায়, আমার একটু তাড়াতাড়ি আছে।

যে দিন তাড়াতাড়ি হয়, সে দিন সময় বুঝি ছুটিয়া চলে।" দোকান-দার হাসিয়া বলিল, "তা আর যায় না; আমাদের মনের গতি, সময় যেমন অবিরাম অবিশ্রাম—নিত্য নিয়মিত ভাবে চলিয়া থাকে তেমনই চলে। আমাদের সুখ বা দুঃখের উপর উহার ভ্রূক্ষেপও নাই।"

বাবু কি উত্তর করিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু তাহা আর হইল না। এই সময় নোট ভাঙ্গাইয়া টাকা লইয়া আসিল, তিনি হস্ত প্রসারণে আড়াইটি টাকা লইয়া বাহির হইলেন। ট্রামগাড়ী একখানা সেই সময় চলিয়া যাইতেছিল, তিনি পড়েন ত মরেন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিতে আরম্ভ করিলেন। ট্রামও দাঁড়ায় না তাঁহারও দৌড় থামে না। অনেক দূর গিয়া হঠাৎ তাঁহার পায়ের জুতায় একটা হুঁছোট লাগিল, করস্থিত টাকা আড়াইটী হস্তচ্যুত হইয়া রাস্তায় পড়িয়া গেল, এবং দুইখানা মটর গাড়ী, একখানা ঘোড়গাড়ী ও খান চারেক গরুর গাড়ী চারিদিক্ হইতে তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। তাঁহার আসন্ন বিপদের অবস্থা বুঝিয়া একজন বলিষ্ঠ পথিক ফুটপাথ হইতে ছুটিয়া আসিয়া টানিয়া লইয়া ফুটপাথে ফিরিয়া গেলেন, এবং ধমক দিয়া বলিলেন,—মহাশয়ের মরণ বাঁচন জ্ঞান নাই, এখনই যে গাড়ীর তলায় পড়িয়া পৈতৃক জানটা খোয়াতে হইত! কলিকাতার রাস্তায় বাহির হইতে হইলে দুর্গানাম করিয়া বাহির
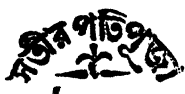
হইতে হয়, আর ঘরে ফিরিয়া গেলে তবে মনে হয় আজিকার এ যাত্রা বাঁচিলাম।"

আমার স্বামী সে শিক্ষাবাক্যে বিরক্ত হইলেন, তাঁহার উপর চটিয়া উঠিয়া ক্রোধোত্তেজিত স্বরে বলিলেন,—"সে শিক্ষা আর আমায় দিয়া কৃতার্থ করিতে হইবে না! বহুদিন কলিকাতায় আছি, কলিকাতার 'হালচাল' জান্‌তে আমাদের কিছু বাকী নাই. যাচ্চেন যান।"

পথিকটি বাবুর মুখের দিকে মুহূর্ত্তের জন্য চাহিয়া অবজ্ঞা-গম্ভীরস্বরে বলিলেন—"ওঃ! এযে দেখ্‌ছি ঢাকার বাঙাল!" তার পর পথিক তাঁহার গন্তব্যাভিমুখে চলিয়া গেলেন। গাড়ীগুলি তত-ক্ষণ সে রাস্তা হইতে চলিয়া গিয়াছিল। আমার স্বামী নামিয়া তাঁহার হস্তচ্যুত মুদ্রাগুলির অনুসন্ধান করিলেন; একটির দর্শন পাইলেন, বাকীগুলি কোন্ খোয়ার মধ্যে অদর্শন হইয়াছিল অথবা কাহারও কর্ত্তৃক আহৃত হইয়া তাহার পকেটে উঠিয়া চলিয়া গিয়াছিল, তাহা স্থির করিতে পারিলেন না। এই সময় পশ্চাদ্দিকে রাস্তা ছাড়িয়া দিবার জন্য ট্রামের ঘণ্টাধ্বনি হইল, তিনি তাড়াতাড়ি ফুটপাথে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং ট্রাম আসিলে তাহাতে উঠিয়া বসিয়া হাঁপ ছাড়িলেন।

বসিবা মাত্র যথারীতি কন্‌ডাক্টর সাহেব দর্শন দিয়া টিকিটের মূল্য চাহিলেন। স্বামীর শার্টের পকেটে পয়সাতে আধুলিতে

দুয়ানীতে তের আনা ছিল, কিন্তু যখন প্রথম ট্রামের অনুগামী হইয়া ছুটিতেছিলেন, তখনকার ঝিকুনীতেই হউক অথবা যখন ফুটপাথে উঠিয়া গোলযোগ করিতেছিলেন তখন কোন পকেটমারার হস্ত পরিচালনাতেই,—হউক সেগুলি স্থানভ্রষ্ট হইয়া চিরদিনের মত সরিয়া গিয়াছে। তখন তিনি কিঞ্চিৎ দুঃখিতান্তঃকরণে কুড়ান টাকাটি কন্‌ডাক্টরের হস্তে দিয়া বড়বাজারের টিকেট চাহিলেন। কন্‌ডাক্টর সাহেব উহা ট্রামগাড়ীর লৌহদণ্ডের উপর আঘাত করিয়া পরীক্ষা করিলেন, তারপরে বাবুর হাতে ফিরাইয়া দিয়া বলিলেন,—"পাল্‌টাইয়া দিন।"

বাবুর আর নাই! পাল্‌টাইবেন কি? বলিলেন,—"কেন, টাকার হয়েছে কি মশায়?"

ক। ভাল না, বদ্‌লে দিন না।

বাবু। আমার সঙ্গে আর নাই।

ক। তবে নেমে যান।

বা। আপনি আর একবার দেখুন, এ ভাল টাকা। এই মাত্র পাল ব্রাদার্সের ওখান থেকে নিয়ে আস্‌ছি।

ক। আপনারা বাবু মানুষ আনতে পারেন, আমাদের মনিবের কাছে বুঝিয়ে দিতে হবে, ভাল না হলে নেয় না।

বাবু তখন পার্শ্ববর্ত্তী একজন ভদ্রলোকের হাতে টাকাটা দিয়া বলিলেন,—"দেখুন দেখি মহাশয়, টাকাটা ভাল নয় না কি?"
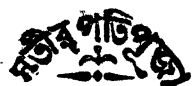
তিনি যাঁহার হাতে দিলেন, তিনি দুই একবার নাড়িয়া চাড়িয়া দুই একবার আঘাত করিয়া দেখিয়া শুনিয়া বলিলেন, "না, টাকাটা কাঁসার।"

বাস্তবিক বাবুর তখন আর 'ট্রামের কড়িও' সঙ্গে ছিল না। নামিয়া পড়িলেন এবং পদব্রজে চলিতে আরম্ভ করিলেন। হায়! কেহ তাঁহাকে বলিয়া দিবার—বুঝাইয়া দিবার ছিল না যে, যে কার্য্যে নামিয়াছ, তাহাতে এই প্রথম পদক্ষেপেই যেরূপ কপর্দ্দক-শূন্য হইয়া হাঁটিতে আরম্ভ করিলে, এইরূপ জীবনে যে কতবারই কপর্দ্দকশূন্য হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে হইবে, তাহা কে বলিতে পারে! এ পথের যাহারা পথিক তাহাদের কর্ম্মফলের সঞ্চিত ভোগ এইরূপ ভাবেই গঠিত হয়।

পথে যাইতে যাইতে তিনি প্রথমে যেমন কষ্ট ও দুঃখ অনুভব করিতেছিলেন, কিয়দ্দূর যাইয়া আর তেমন রহিল না। তাঁহার চিত্তপটে এক সুখের ছবি ফুটিয়া উঠিয়া তাঁহাকে বিভোর করিয়া তুলিল। তিনি ভাবিতে ভাবিতে চলিলেন, এখনই তাঁহার আবাস-কক্ষে গমন করিয়া প্রথমেই সুগন্ধি সাবান-জলে সর্ব্বাঙ্গ ধৌত করিয়া, সেই সাদর-সমাহৃত সুগন্ধি-সম্ভারে সর্ব্বাঙ্গ আপ্লুত বিপ্লুত করিয়া লইবেন, তারপরে মোজা কাপড় পরিবেন। তদনন্তর ফরাসডাঙ্গার এই সুন্দর বস্ত্র পরিহিত হইয়া গেঞ্জিটি গায় দিয়া সিল্কের পাঞ্জাবী গায় মুড়িয়া রুমালে তাহার পকেট পূর্ণ করিবেন।

তারপরে চুলগুলি, যেরূপ ভাবে বাগাইয়া মস্তকের উপর সাজাইয়া দিলে তাঁহাকে অতি সুন্দর দেখায়, তাহাই করিবেন। গোঁপ দাড়ি এমন কি ভ্রূদুটি পর্য্যন্ত আঁচড়াইয়া বাগাইয়া এমন ভাবে ঠিক করিবেন, যে দেখিলে মুনিজনেরও মন হরণ করে! বলা বাহুল্য, মুনিজনের না হইয়া মুনিকন্যার ভাবাই কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু তিনি যখন ভাবিলেন মুনিজনের, আমি সত্যের অপলাপ করিয়া কি করিয়া বলিব মুনিকন্যার? তবে আমার একটু ভুল হইয়াছে বটে, তিনি পায়ের মোজা হইতে পরিধেয় বস্ত্র, গায়ের গেঞ্জী, পাঞ্জাবী, পকেটের রুমালগু'ল সমস্তই সুগন্ধিসম্ভারে সিক্ত করিয়া লইবার চিন্তা হইতে বিরত হন নাই। তারপরে মস্তকের চুলগুলিও— টেরি কাটার পূর্ব্বে এবং পরে সুগন্ধিসিক্ত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। অতঃপর পকেটে ঘড়ি পূরিয়া স্বর্ণের চেন ঝুলাইয়া সার্দ্ধতোলকপরিমিত যষ্টিখানি দক্ষিণ করে এবং ভাল করিয়া পড়িতে পারুন আর নাই পারুন, এক আনা মূল্যের একখানি ইংরেজি কাগজ বাম হস্তে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যখন তাঁহার প্রণয়িনীর দৃষ্টিপথে পড়িবেন, তখন সে বেচারা মোল্লাকৃত জবাই করা মুরগীর মত ছট্‌ফট্ করিতে থাকিবে, এবং তারপর সে রাত্রে বিরহ-বিষের জ্বালায় তাহার আর নিদ্রা হইবে না; পর দিবস শুভ মিলন নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী! কিন্তু হায়! সে মোহান্ধ যুবকের—আমার স্বামী দেবতার সে সুখ চিন্তার ভিতরে এ
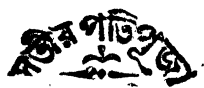
অশুভ সত্যের একটু আভাসও উঠিতে পারিল না, যে দ্বিতল বা ত্রিতল প্রাসাদের শীর্ষদেশে আলিসাবৃত স্থানে দাঁড়াইয়া রাজপথে দণ্ডায়মান তিনি— তাঁহার গাত্রগন্ধ প্রাপ্ত হইয়া এবং প্রত্যেক পরিচ্ছদের সম্পূর্ণ শিল্পসৌন্দর্য্য বা তাঁহার রূপের পূর্ণ লাবণ্য দেখিয়া কেমন করিয়া, মজিয়া মজিয়া, পচিয়া রূপান্তরিত অবস্থা প্রাপ্ত হইবেন!

যাহা হউক, তিনি তখনকার মত মোহের কল্পনানন্দ বুকে করিয়া তন্ময় হইয়া বাসকক্ষের বারাণ্ডায় উঠিলেন। গৃহের দিকে চাহিতেই তাঁহার ঘর্ম্মসিক্ত কলেবর আরও ঘামিয়া উঠিল, বুক ভরা আনন্দের ছবি ঝটিতি অন্তর্হিত হইয়া গেল, একি! গৃহের দরজার চাবি কোথায়? অর্গল অনাবদ্ধ কেন? তবে কি তিনি যাইবার সময় ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া চাবি দিয়া যান নাই? তাড়াতাড়ি গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন, দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বস্ব অপহৃত হইয়াছে। অতি কষ্টে সঞ্চিত, অতি সাধে সমানীত দ্রব্যগুলি কে লইয়া চলিয়া গিয়াছে। হায়, এখন উপায় কি? আর ত সময় নাই। বাক্সর দিকে চাহিলেন, বাক্সের সন্নিকটে গিয়া ডালা তুলিলেন, চাবি খোলা, তাহার মধ্যে যাহা ছিল—যে টাকা কয়টী বাক্সে ছিল, তাহার দ্বারা না হয় নিকটস্থ বাঙালীর দোকান হইতে ছাই ভস্ম জিনিষ যাহা মিলিত, তাহাই কিনিয়া লইয়া কোন প্রকারে যাইতে পারিতেন, এখন উপায় কি? তিনি ছট্‌ফট্‌ করিতে

লাগিলেন, ইচ্ছা হইল মেঝেয় পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করেন। হায়! এত সাধের দিনে এমন বিষাদ কেন ঘটিল? কে এমন কাজ করিল? তাহার মরণ হয় না কেন? সে সবংশে জেলে যায় না কেন? ভগবান্ কি নাই;—তিনি বিচার করেন না কেন? সে যে পাপ কার্য্য করিয়া গিয়াছে, রাস্তার মধ্যে তাহার মাথায় বাজ পড়ে নাই কেন? কিন্তু কোন সমদর্শী উচিত বক্তা সেখানে উপস্থিত থাকিলে তাঁহাকে বলিয়া দিতে পারিত,—ভগবান্ আছেন, তাঁহার সুবিচার আছে, পাপীর মস্তকে বজ্রাঘাতও আছে, তবে সকলে বিচার করিয়া দেখে না, অনুভব করিতে পারেন না, এই যা দুঃখ। সে আরও বলিয়া দিতে পারিত,—তুমি কি করিতে যাইতেছ?—একজন কুলাঙ্গনার—একজন সতীর সতীত্ব নষ্ট করিতে একজন পাপীয়সীকে নিযুক্ত করিয়াছ এবং নিজে এখনও সেই কার্য্যে অগ্রসর হইতেছ। ছলনা, প্রলোভন, অর্থদান প্রভৃতি কোন কার্য্যই বাকী থাকিতেছে না। এর চেয়েও কি সেই নিম্নশ্রেণীর একটা চোরের অপরাধ অধিক? সে তোমার জিনিষগুলি চুরি করিয়া ভগবানের বিচারেরই বিকাশ করিয়াছে।—আর তোমার বুকে বজ্রাঘাতের যাতনারই বিকাশ করিয়াছে। এখনও সাবধান হও, এখনও সেই মহিমময়ের মহিমার কথা স্মরণ করিবার শক্তি যখন আছে, তখন বুঝিয়া দেখ, অনুভব কর—একাজে নামিয়াই আগাগোড়াই এইরূপ

অশান্তি ভোগ করিতে থাকিবে। কিন্তু হায়! সেখানে কেহ ছিল না, তাঁহার বিবেক শক্তিও ইতঃপূর্ব্বের অনুষ্ঠিত পাপাচরণে প্রহত! তিনি তখনই উর্দ্ধশ্বাসে আড়ং বাড়ী অভিমুখে ছুটিলেন এবং সেখানে গিয়া পুনরপি একশত টাকা চাহিয়া লইয়া রাস্তায় আসিয়া ট্রামে চাপিলেন এবং চিৎপুর রোডে পাল ব্রাদার্সের বিখ্যাত কাটা কাপড়ের দোকানে প্রবেশ করিয়া উপস্থিত মত যাহা পাইলেন তাহাই ক্রয় করিয়া লইয়া বাহির হইলেন এবং উপস্থিত মত একজোড়া পামসু ও সাধারণ এক মনোহারীর দোকান হইতে মোজা তোয়ালে সাবান ও কয়েকটী গন্ধ দ্রব্য কিনিয়া লইয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন। তারপরে হরিষ-বিষাদহৃদয়ে প্রসাধন কার্য্য সমাধা করিয়া পাঁচটার সময় গৃহের অর্গল ও চাবি বন্ধ করিয়া নাপিতিনীর নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইয়া পদচারণা করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ক্রমে সূর্য্য তাঁহার অস্তসীমায় গমন করিলেন, ক্রমে কলিকাতার রাজপথ সান্ধ্য ভ্রমণকারিগণে পূর্ণ হইয়া উঠিল, ক্রমে রাস্তার পার্শ্বস্থ বিপণীপুঞ্জে সৌদামিনী জ্বলিয়া উঠিল। তারপরে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল এবং কলিকাতা মহানগরীর মহদুপসর্গ ধূমরাশিতে সন্ধ্যার সুখদ-শীতল বায়ুকে আচ্ছন্ন প্রচ্ছন্ন করিয়া পথিকের দৃষ্টিভ্রম জন্মাইতে লাগিল, তখন তিনি নিজ বাসকক্ষে ফিরিয়া চলিলেন। কখন কোন্ মুহূর্ত্তে

কেহ তাঁহাকে দেখিয়া গেল কি না তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না। যখন বাসায় ফিরিয়া গিয়া সেই বিষয়ের চিন্তা করিতেছিলেন এবং পকেট হইতে মূল্যবান্ একটি সিগারেট বাহির করিয়া লইয়া তাহার মুখে আগুন ধরাইয়া দিয়া টানিয়া টানিয়া তাহার ধূমপান করিতেছিলেন; সেই সময় হাসিমুখে সাফ-ল্যের গর্ব্বিত পদ-বিক্ষেপে নাপিতিনী গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া বাবু মুখের সিগারেট হাতে লইয়া এবং গালের ধুঁয়া বাতাসে মিশাইয়া দিয়া বলিলেন,—"ঐ চেয়ার খানায় বস, খবর কি? আমি যাইতে পারি নাই তজ্জন্য মাপ করিও। বিশেষ একটি কার্য্যের অনুরোধে স্থানান্তরে যাইতে হইয়াছিল বলিয়া এইরূপ হইয়াছিল।"

বলা বাহুল্য, আমার স্বামী মহাশয় চতুরতা করিয়া সেই নাপি-তিনী—পিশাচী নাপিতিনীর কার্য্যের সত্যাসত্য পরীক্ষা করিতে-ছিলেন। কিন্তু হায়! তাহার মত কামকবলস্থ যুবকগণ যদি তাহাদের কর্ম্মজাল বিচ্ছিন্ন করিতে পারিত, তাহা হইলে কলিকাতার অনেক সাজান সখের সংসারে হাহাকারের রোল উঠিত না। মাসী হাসিয়া বলিল,—সেকি বাবা!—মাসীর সঙ্গেও চালাকি? তুমি না যেতেই জান্‌লে আমার আগেই গিয়া ছাতে উঠেছিলুম। আর তুমি চলে এলে আমরা নেমে এই আসছি।"

বাবু অতিশয় হৃষ্ট হইলেন, ইহা সত্য অতিসত্য! মাসীর

কাজে আর অবিশ্বাসের কিছু নাই। তখন তিনি নিতান্ত সুবোধ বালকের ন্যায় মাসীর নিকট সমস্ত বারতা অবগত হইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। মাসী হাসিয়া বলিলেন,—"তোমার কাজে কি আমার অবহেলা আছে। অবোধ ছেলে! কাল তোমার কাছথেকে জান্‌লে টাকা নিয়ে গিয়ে পাড়ার প্রধান পাঁচজনকে ধরে কোন রকমে—জান্‌লে পুলিশ হাঙ্গামা মিটিয়ে দিলুম। তাও এখন পনর টাকা প্রধানী দেওয়া বাকী আছে, জান্‌লে—পাড়ার পাঁচজন প্রধান লোকে কাজ মিটিয়ে দিয়েছে, তারাই খাবে, জান্‌লে পনর টাকার মোটে দাবী করিয়াছে—জান্‌লে তা না দিলে কি আর বাস করা যায়? আপদ আছে, বিপদ আছে, জান্‌লে পাড়ার মধ্যে আমার ভারি মান। প্রধান পাঁচ জনের জন্য জান্‌লে আমাকে কেহ হুঁ টী কর্‌তে পারে না। ঐ পনের টাকা আজ সন্ধ্যার পরে দেব বলেছি, কিন্তু তাহার চেষ্টাতে কোথাও যেতেও পারিনি,—তোমার কাজেই আজ সারাদিনটা ছুটোছুটি করে ফিরেছি, জান্‌লে বাবা,—যখন সব সাহায্যই করেছ, তখন দুঃখিনী মাসীর এই অভাবটা ঘুচিয়ে দেও।"

ব্যস্ত হইয়া বাবু বলিলেন,—"সে হবে এখন মাসী, আপাততঃ আমার কাজের কি করলে শুনি।"

মাসী হাসিয়া বলিল,—"অবোধ ছেলে; তোমার মাসী যে কাজে হাত দেয় সে কাজ কি আর বাসী হতে দেয়, কাজ হাসিল

জানলে বাবা, তুমি একটা দোষ করে গেছিলে—বাঙালের মত পোষাক করেছিলে। তবে আমরা ওসব বুঝিনে বাবা, তিনি বলছিলেন—তিনি বলছিলেন।

বা। পোষাকটার একটু গোলযোগ হয়ে গেছিল মাসী, সে দুঃখের কথা অন্যদিন বল্‌বো। আমার সৌভাগ্য যে, আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তমা, আমার জীবন অপেক্ষা প্রয়োজনীয়া, আমার হৃদ্‌পিণ্ড অপেক্ষা রমণীয়া, আমার দেহ অপেক্ষা পালনীয়া, সেই সুন্দরী মুহূর্ত্তেকের জন্যও দৃষ্টি করিয়াছেন।

না। মুহূর্ত্তেক কি গো? ঝাড়া এক ঘণ্টা;—তুমি যে দিকে যখন গিয়াছ, সেই ডাগর ডাগর চোখ দুটীও দর্শনপিপাসু হইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়াছে, তার পরে হঠাৎ তুমি চলিয়া আসিলে। হঠাৎ বালকের হস্ত হইতে সুন্দর খেলানা পড়িয়া গিয়া তাহার দৃষ্টিপথের বাহিরে গেলে, সে বালক যেমন অস্থির হইয়া পড়ে, তোমার প্রণয়িনীও তেমনি হইয়াছিল।

বা। সত্য মাসী;—সত্যই আমার এমন সৌভাগ্য? আমি তাঁহাকে দেখিতে পাই নাই। কি করিয়া সে শুভক্ষণ আসিবে মাসী? আমার জীবন দিতেও প্রস্তুত আছি।

না। জীবন দিতে হবে না বাছা, জীবন দিতে হবে না। মাসীর হাতে যে কাজের ভার দিয়েছ, তাকি নিষ্ফল যায়?

বা। কোথায় দেখা হবে মাসী? তার কিছু কথাবার্ত্তা হয়েছে?

না। হয়েছে বৈ কি।

বা। কোথায় ?

না। কালীঘাট যেতে হবে। তুমি এদিক্ দিয়ে গিয়ে মায়ের নাটমন্দিরে উপস্থিত থাকিবে। তিনিও নাটমন্দিরে যাবেন। সেখানে দেখা সাক্ষাৎ হবে, তারপরে বাহিরে বেরিয়ে এলে, যখন তিনি দুই একটা জিনিষ পত্র কিনবেন, সেই সময় দুই একটা কথাবার্ত্তা হবে, সে দিন ঐ পর্য্যন্ত কেমন জানলে ?

বা। তাঁর সঙ্গে আর কে যাবে ?

না। তাঁর পিসী যাবে। তাঁর মা নাই, ছোট কালে মা মরে গেছে, ঐ পিসী মানুষ করেছে, পিসীকে মা বলে ডাকেন।

বা। আমি চিনবো কি করে ? কত সুন্দরী কত ভদ্রমহিলা সে নাটমন্দিরে যাতায়াত করিতেছে।

না। কেন; আমি যাব কোথায়! জানলে আমিও সঙ্গে থাকবো।

বা। ওঃ! তা হলে আর কথা নেই; কিন্তু বাহিরে আসিয়া যখন বাজার করিয়া ফিরিবেন, তখন তাঁহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিলে বা দুই একটা কথা বলিলে, তাঁহারা কি মনে করিবেন ?

না। আমি পরিচয় দিব, এ আমার বোন-পো বেটা এখানে অফিসের বড়বাবু। আমি আসবো সেই সংবাদ দিয়েছিলুম, তাই দেখা করবার জন্য এসেছে।

বা। আচ্ছা সে সময় দুচারিটী জিনিষ বা খাবার-টাবার কিছু তাঁহাকে কিনিয়া দিলে কোন দোষ হইবে কি?

না। কিছু দোষ হবে না জান্‌লে, আমি যে কাজের মধ্যে আছি, তাতে আবার দোষ! দেখি পারি যদি তোমাদের দেখা শুনার বা কথাবার্ত্তা কইবার বা একত্রে বসিয়া সংক্ষেপে মনের কথা বলিবার যদি আর সুযোগ করিয়া দিতে পারি, তাও কর্‌বো।

বা। কি কর্‌বে মাসী? আমি তোমার নিতান্ত কৃপা-ভিখারী।

না। যদি কালীঘাট গিয়ে তাঁর পিসীমাকে আলিপুরের বাগান দেখান মত করাতে পারি, জান্‌লে—তাহ'লে তোমাদের খুব সুবিধা হবে। এক সঙ্গে দু তিন ঘণ্টা বেড়ান, দুই একবার একসঙ্গে বেঞ্চে বসা,—এমনি ছোট ছোট করিয়া মনের কথা বলাও চলিবে, কেন না সে বুড়ী কাণে একটু কম শোনে।

বা। মাসী,—সত্যই তুমি আমার আর জন্মের কেউ ছিলে। তোমার এই সব যোগাড়ে আমি তোমার নিকট জীবনের মত বিক্রীত রহিলাম। তাঁহার পিসী আমার সহিত ঐ বাগানে লইয়া যাইতে স্বীকৃত হইবেন?

না। ওগো তুমি গাড়ী করে নিয়ে যাবে, বাগান দেখান খরচা দেবে, এ জান্‌লে অমত কর্‌বে না। যদিই একটু এদিক্ ওদিক্ করে, আমি বল্‌বো আমার বোন্‌-পো খরচ দেবে, তোমরা
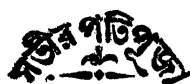
যাবে না আমি তা হলে নিহাত রাগ করবো,—তাহলে আর কোন আপত্তিই করবে না, জান্‌লে অবোধ ছেলে, বাঁধা গরু দড়িছাড়া পেলে যেমন দিক্‌-বিদিক্‌ না মেনে ছুটে বেড়ায়, কলিকাতার গেরস্থ ঘরের মাগীগুলো ঘরথেকে বার হলে আর বড় কিছু মেনে চলে না। মিন্‌সেগুলোকেও দেখিছি যদি পয়সা না দিতে হয়, তবে মাগীগুলোকে থিয়েটারে যেতে, কালীঘাটে যেতে, বাগানে যেতে, গঙ্গাস্নানে যেতে এমন কি মন্দিরে, মঠে, যেখানে ইচ্ছা হয় সেই খানেই যেতে বাধা দেয় না।

বা। কবে যাবে মাসী ?

না। যবে তোমার ইচ্ছা।

বা। কাল ?

না। সুবিধে হবে কি ?

বা। সুবিধা কি হবে ?

না। যেতে হবে এই পর্য্যন্ত কথা হয়েছে, কিন্তু কবে যেতে হবে তাত বলা হয়নি। জান্‌লে আমি তাকে বলব, তিনি তাঁর পিসীমাকে ধরবেন, তাঁর পিসীমা আবার বাড়ীর সকলের মত করাবেন, জান্‌লে পোরশু না হলে আর ঘটে না।

বা। তবে তাই।

অতঃপর আরও অনেক কথা হইল, তার পরে আমার স্বামীর হিতৈষিণী মাসী পঞ্চদশটী মুদ্রা আঁচলে বাঁধিয়া লইয়া সে রাত্রের

মত বিদায় লইলেন। সমস্ত দিবসের ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া আমার স্বামী অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, একটু বিশ্রাম-লাভার্থ সেই গৃহের শয্যার উপর শুইয়া পড়িলেন এবং কিয়ৎক্ষণ পরেই গম্ভীর নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন। জানালা, দরজা সমস্তই খোলা রহিল; পেটে একমুষ্টি অন্ন পড়িল না, অভুক্ত অবস্থাতে নিশার শ্রান্তি গভীর নিদ্রাতেই কাটিয়া গিয়াছিল। আমরা এদিকে বাড়ীতে তাঁহার জন্য উত্তম উত্তম খাদ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়া, তাঁহার আগমন প্রতীক্ষায় সমস্ত রজনী বিনিদ্র ভাবেই কাটাইয়া দিয়াছিলাম।

বিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

পুষ্প।

বেলা দশটা বাজিয়া গিয়াছে। কালীঘাটে মাতৃমন্দিরে লোক জনের গমনাগমনে অতিশয় জনতা হইয়া পড়িয়াছে। মন্দিরমধ্যে সেইদিন মাতৃদর্শনেচ্ছু নরনারীর গমনাগমনে জন-সঙ্ঘ কিছু অধিক হইয়াছিল, নাটমন্দিরে কেহ কেহ চণ্ডীপাঠ করিতেছেন, কেহ কেহ একান্তমনে মাতৃনাম জপ করিতেছেন, কেহ কেহ হোম করিয়া হোমাগ্নিমুখে সংস্কৃত হবিঃ দান করিয়া মাতৃ-কৃপা আকর্ষণ করিতেছেন। নাটমন্দিরের দক্ষিণদিক ঘন ঘন ছাগকণ্ঠবিচ্ছিন্ন রুধির-ধারায় বিপ্লাবিত হইতেছে। সর্ব্বত্রই জনতা, সর্ব্বত্রই কোলাহল। আমার স্বামী অনেকক্ষণ আসিয়া নাটমন্দিরের পশ্চিম পার্শ্বে তৃতীয় স্তম্ভের শেষ সিঁড়ির উপর প্রতীক্ষা-স্তব্ধ হৃদয়ে 'সে আসিবে' বলিয়া বসিয়াছিলেন। ন'টা হইতে দশটার মধ্যে তাহারা আসিবে এইরূপ ঠিক করা ছিল, কিন্তু দশটা বাজিয়া গেল, তবু দাসীর দর্শন মিলিল না। স্বামীর হৃদয় ভাঙিয়া পড়িতে লাগিল;—বুঝি আসিবে না। আরও দশ মিনিট কাটিল; প্রতীক্ষায় সন্দেহ আসিল। কৈ এখন ত

দেখা নাই, তবে বুঝি আসা হইবে না! আরও—দশ পনর মিনিট অতিবাহিত হইয়া গেল, তবে বুঝি নিশ্চয় আসিল না। বড় আশায় বড় নিরাশা; মৃত্যুর তুল্য যাতনাপ্রদ। তিনি উঠিয়া যাইবেন কি, আরও খানিক প্রতীক্ষা করিবেন, আগমনদ্বারের দিকে চাহিয়া যখন এরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, তখন বড় তৃষ্ণার্ত্ত চাতক পাখীর দৃষ্টিপথে আকাশ ভরা মেঘের মত মাসীর দর্শন মিলিল। কিন্তু তাহার আশে পাশে পশ্চাতে স্ত্রী পুরুষ বহু জনতা —কাজেই তিনি স্থির করিতে পারিলেন না, এসঙ্গে তাঁহার মানসমোহিনী প্রণয়িনী আছেন কি না? চাতক বুঝিল না, এ মেঘে জল হইবে, কি মেঘ ডাকিয়া বজ্রপাত হইবে। মাসী-মেঘ যদি গর্জ্জন করিয়া 'সে ত এল না' এই বজ্র নিক্ষেপ করে' তাহা হইলে বোন্-পো-চাতক জলধারা আশে, মেঘপানে চাহিয়া বজ্রাগ্নি বিদগ্ধ হইয়া পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইবে।

কিন্তু চাতকের সে ভয় ভাঙ্গিল, মাসী-মেঘ ত জলভারে অবনত হইয়া চাতকের নিকটবর্ত্তী হইয়া পড়িল। চাতকের হৃদয় আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। দ্বারের জনতা তখন বহুভাগে বিভক্ত হইয়া মন্দিরমধ্যে দলে দলে আপন আপন গন্তব্য স্থানাভিমুখে গমন করিল। মাসী আসিলেন, তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট নাটমন্দিরে তৃতীয় স্তম্ভের সন্নিকটে সেইখানে তাঁহার বোন্-পো উপস্থিত থাকিলেন। মাসীর পশ্চাদ্ভাগে অতসীকুসুমবর্ণা, পরিপুষ্টদেহা, নিবিড়-

নিতম্বা, ঘনজঘনা, কুচভারনমিতাঙ্গী, অলক্তমাখা চরণে মরালী-গমনে, এক যুবতী আগমন করিতেছিলেন। তাঁহার পরিধানের নিম্নে সূক্ষ্ম বস্ত্রের শামিজ, তদুপরি সুচিক্কণ নূতন ফ্যাসানে ঢাকাই বস্ত্র পরা, তদুপরি সিল্কের মিহি চাদরে সর্ব্বাঙ্গ আচ্ছাদিত। কিন্তু সেই পীতবর্ণের রেশমী চাদর ভেদ করিয়া তাঁহার গায়ের বর্ণ, জ্যাকেটের বর্ণ ও সাচ্চার বর্ণ ও শিল্পচাতুর্য্য এবং মুখের মনোহারিতা সকলেই দেখিতে পাইতেছিল। সে মুখ দেখিয়া—সে আকর্ণবিশ্রান্ত চক্ষু, সে রক্তসম্পুট অধর ওষ্ঠ, সে লোহিত গণ্ডদ্বয় দেখিয়া মাসীর বোনপোর সর্ব্বাঙ্গে তড়িৎ-তেজ খেলিতে লাগিল। 'প্রাণের ভিতর প্রাণ' লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিল, কতক্ষণে সে একটি কথা কয়। যুবতী যদি তাঁহার সহিত কথা না কহে, তবে তাঁহার জন্মগ্রহণই বৃথা। এইজন্য বুঝি সাধুগণ বলিয়া থাকেন, মানবজন্ম দুর্লভ জন্ম! কারণ পশু আদি জন্মে এমন সৌন্দর্য্য—এমন রত্ন উপভোগ কি প্রকারে ঘটিবে? আর যদি কথা না কহে, তবে ত ঘরে গিয়া তাঁহার বাস করাই চলিবে না তখন উপায়? উপায়,—গলায় দড়ি দিয়া মরা।
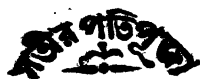
কিন্তু সে চিন্তা তাঁহাকে অধিক্ষণ করিতে হইল না। মাসী আসিয়া বোনপোর অতি সন্নিকটে দাঁড়াইলেন, মাসীর পশ্চাদ্‌ভাগে সেই যুবতী ও যুবতীর পার্শ্বে চঞ্চল নয়না, ঘনদৃষ্টিসম্পন্না, খর্ব্বদেহা প্রৌঢ়বার্দ্ধক্যের সন্ধিক্ষণবয়সসমুপস্থিতা এক রমণী দাঁড়াইলেন।
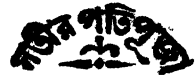
তাঁহার হস্তে গামোছাবৃত একখানি বস্ত্র। বোন্‌-পো তাড়াতাড়ি উঠিয়া মাসীকে প্রণাম করিলেন, বৃদ্ধাকে প্রণাম করিলেন, যুবতীকে প্রণাম করিলেন না। যুবতী তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইলেন কি না আমরা ঠিক বলিতে পারিব না।

এখন বোন্‌-পোর উপর ভার পড়িল, ভাল করিয়া ঠাকুর দেখান। মাসীর সহিত পূর্ব্ব পরামর্শ অনুসারে বোন্‌-পো মন্দিরের সে দিনকার যাহার পালা, তাঁহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, নগদ দশটী রজত মুদ্রা প্রদান করিলে, তিনি মন্দিরের জনতা বাহির করিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে কয়েক মিনিটের জন্যে শূন্যমন্দিরে মাতৃদর্শনের অধিকার দিবেন, সে ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তখন তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরে গমন করিলেন এবং প্রধান পাণ্ডা মহাশয়ের হস্তে অন্যের অলক্ষ্যে—দশটী টাকা প্রদান করিলেন, কেন না তিনি এখানকার অফিসের বড় বাবু, তাঁহার খাতিরে কার্য্য সম্পন্ন হয়—বড় পাণ্ডা আরও কয়েক জনের সাহায্যে শত শত মাতৃভক্ত দর্শক নরনারীকে পাশববলে মন্দির হইতে বিতাড়িত করিয়া দিলেন। স্বামী আমার শূন্যমন্দিরে তাহাদিগকে ঠাকুর দেখাইয়া কৃতার্থহৃদয়ে বিজয়ের গর্ব্বিত পদবিক্ষেপে মন্দির হইতে বাহির হইলেন। ভেকধরা দুঃখিনী রমণীগণ সঙ্গে আসিল। এইবার পূজা ও কাঙ্গালীবিদায়।

প্রধান পাণ্ডা আসিয়া ধরিল, আপনাদিগকে আর কি বলিব —

আজকার মায়ের ভোগের খরচ আপনাকেই দিতে হইবে। সে আর কতই বা, ধরিতে গেলে আপনার পক্ষে কিছুই নয়। পঞ্চাশটী টাকা হইলে সম্পন্ন হইবে। আর পূজা ষোড়শোপচারে দিন, মায়ের একটি নথ দিতে হইবে।

অত রূপসী নব প্রণয়িনীর সম্মুখে পয়সায় খেলো হওয়া চলে না;—দুই একবার আপত্তি করিয়া অবশেষে সর্ব্বসাকুল্যে পঞ্চাশ টাকার রফা হইয়া গেল! পঞ্চাশ টাকার নোট গণিয়া দিয়া যখন তাঁহারা সিঁড়িতে নামিলেন, তখন কালীঘাটের কুমারী ও ব্রাহ্মণগণ-হস্তবিনিঃসৃত পুষ্পমাল্যে তাঁহাদের গলদেশ আচ্ছন্ন হইয়া গেল এবং 'ভিক্ষা দাও' প্রার্থনায় মন্দিরমধ্যস্থ সমস্ত স্থান মুখরিত হইয়া উঠিল। কাঙ্গালিগণও আসিয়া সঙ্গে যোগদান করিল। সে জনতা-বহুল ঠেলিয়া তাঁহাদের বাহির হওয়া দুষ্কর ঘটিয়া গেল। তখন চীৎকার করিয়া মাসীর বোন্-পো প্রধান পাণ্ডাকে ডাকিলেন, এবং উহাদিগকে সরাইয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনি সে অনুরোধ গ্রাহ্য করিতে যখন আপত্তি উত্থাপন করিলেন, মাসীর বোন্-পো বলিলেন,—আপনি এই দশটী টাকা লইয়া উহাদিগকে বিদায় করুন,—আমাদিগকে অব্যাহতি দিন। তখন তাঁহার অর্দ্ধেক প্রাপ্তি সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি সে ভার গ্রহণ করিয়া বাবুদের গমনে পথ করিয়া দিলেন।

এখন বিশ্রাম ও আলাপ।

মন্দিরের বাহিরে গমন করিয়া মাসীকে মাসীর বোন্‌-পো বলিলেন,—"মাসী, তোমাদের খাওয়া দাওয়ার কি ?"

মা। আমাদের ত সঙ্গে গাড়ী আছে। সেকেণ্ডক্লাশের গাড়ী প্রথম ঘণ্টা বার আনা, তার পরে প্রতি ঘণ্টা ছয় আনা হিসাবে ঠিক করা হইয়াছে। জানলে যখন গাড়ীতে উঠি তখন সাড়ে আটটা বেজেছিল। আমরা ত ঠিক করে ছিলাম বাড়ী গিয়ে ভাত খাব, যাবও তাই।

বো। বাগান বেড়াতে যাবেন না ?

যুবতী একটু দূরে দাঁড়াইয়াছিলেন, ধাঁ করিয়া নাপিতিনীর নিকটস্থ হইয়া মৃদুস্বরে বলিলেন,—"যাব।"

আমার স্বামী স্বর্গকিন্নরীর সঙ্গীতের স্বরঝঙ্কার শুনিতে পাইলেন। প্রভাতে সেতারনিস্যন্দিনী ললিতের প্রথম আলাপচারির পঞ্চমের শেষ রেস্‌টুকু তাঁহার প্রাণের কাণে পৌঁছিল। তিনি উদ্বেলিত হৃদয়ে বলিলেন,—"তবে চলুন।"

যুবতীর পিসী কিঞ্চিৎ বিরক্ত হইয়া বলিলেন,—কোথাকার বাগানে যাব গো ?"

যু। আলিপুরের বাগানে। তুমি কখনও দেখনি, আমি সেই ছোটকালে একটিবার দেখেছিলুম। সে এক মনোহর স্থান। বহু পশু, পক্ষী, সর্প, সরীসৃপ, বহু হিংস্র জন্তু, বহু খনিত জলাশয়, বহু
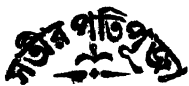
কুঞ্জ ও কত কুঞ্জবীথিকা প্রভৃতিতে সে বাগান যে কি ভাবে সাজান, দেখিলে অপূর্ব্ব আনন্দলাভ করা যায়।

পি। বাড়ীতে বলেও আসিনি। আর তচ্চ গাড়ীভাড়া ও দেখিবার খরচ-আদিও সঙ্গে আনি নি।

মাসীর বোন্‌-পো তদুত্তরে অতি বিনীত ভাবে বলিলেন,— "দাস উপস্থিত থাকিতে সে জন্য আপনার ভাবনা কি? দেখিতে যদি ইচ্ছা হয় চলুন, ওসকল আমিই বহন কর্‌বো। কতইবা খরচ!"

অতঃপর বাজার করা আরম্ভ হইল। মায়ের মন্দিরের সম্মুখের দোকান হইতে আরম্ভ করিয়া আর পুলের নিকট পর্য্যন্ত প্রায় দোকানই অনুসন্ধান করা হইল,—যেখানে যে দ্রব্য ভাল মিলিল, সেখান হইতেই তাহা ক্রীত হইল। তাঁহাদের গাড়ী পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিল, ক্রীতদ্রব্য সমুদয় গাড়ীতে বোঝাই দেওয়া হইয়া গেল। দ্রব্যের মূল্য সমুদয়ই আমার স্বামী প্রদান করিলেন, কিন্তু দ্রব্যগুলি মাসীর, পিসীর ও সেই যুবতীর হইল। তার পরে একটী দোকানে বসিয়া 'মনের মত' জলযোগান্তে রমণীত্রয় গাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিলে বাবু ক্যোচমানের কাছে ক্যোচবাক্সে গিয়া উপবেশন করিলেন এবং চালক অনুমত্যনুসারে আলিপুরের জুলজিক্যাল গার্ডেনাভিমুখে চালাইয়া দিল।

বাগানে গিয়া পশু, পক্ষী, রাস্তা, জলাশয়, লতাকুঞ্জ এ সকল দেখিয়া এবং সেই সময় প্রণয়িনীর সঙ্গে ভ্রমণ করাতেই আমার স্বামী

বোধ হয় স্বর্গ-সুখ লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সকল কর্ম্মেই বিরতি, ব্যবধান ও ব্যবধানে বিরহ আছে। বেলা তিনটা বাজিয়া গেলেই তাঁহারা বাগান হইতে বাহির হইলেন, এবং যথানিয়মে যানা-রোহণে ধর্ম্মতলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাবু গাড়ী হইতে নীচে নামিয়া হিসাব করিয়া খোরাকী সমেত চারিটী টাকা ভাড়া মাসীর হাতে প্রদান করিয়া তিনি ছুটি লইলেন। কারণ আর তাঁহার সে গাড়ীতে যাইবার অধিকার ছিল না। যে হেতু সে গাড়ীতে তাঁহাকে দেখিলে যুবতীর আত্মীয় স্বজন সন্দেহ করিতে পারে। গাড়ী ছুটিয়া উত্তর মুখে চলিয়া গেল, তিনি ট্রামের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। বিরহ-বিকারে তখন তাঁহার প্রাণ নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছিল। তাঁহার মনে হইতে লাগিল,—হায় জগৎ, তুমি এত অন্তঃসারশূন্য কেন? তোমাতে কোন কিছু স্থায়ী হয় না কেন? আজ সমস্ত দিন যে আনন্দ উপভোগ করিতে-ছিলাম, এত শীঘ্র তাহার অপনোদন হইয়া গেল কেন? আর আনন্দের ধারে দুঃখের দ্বিগুণ জ্বালা বসিয়াছিল, তাহা কে জানিত। তখন তাঁহার মনে এই হইল যে, আজ সমস্ত দিন যে আনন্দ যে সুখ উপভোগ করা হইল, তাহাকে চিরস্থায়ী করিতেই হইবে। যাহাতে সুখ হয়, তাহাই করা মানুষের কর্ম্ম। স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয়, স্বজন মরিলে কেহ সঙ্গে যাইবে না। সমস্তই দুদিনের জন্য, মানুষ মরিলে শ্মশানে পুড়িয়া খাক্ হইতে হইবে; তখন কেহই সঙ্গে

যাইবে না। অতএব যে দুদিন বাঁচা যায়, সে কয় দিন মনের মত সুখ উপভোগ করিয়া লওয়াই ভাল।

অনেক দিন হইতে পাপ কার্য্য করিয়া আসিয়, তাঁহার বিবেক শক্তিটা বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সে তাহার এই অবিবেক উক্তির—অবিবেক চিন্তার কাছে মাথা তুলিতে পারিল না। যদি পারিত তবে অবশ্যই শুনাইয়া দিত,—জীবনে যদি মরণ থাকা ঠিক হয়, স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না থাকা যদি জ্ঞানে আসে, তবে আবার নূতন বাঁধনে বাঁধা পড়া—নূতন পাতকের বাহুবন্ধনে বিজড়িত হওয়া—নূতন আগুন ডাকিয়া লইয়া বুকে পোষার প্রয়োজন কি? কয়েক দিনের মধ্যেই দেখিবে—বুঝিবে, তোমার এই কুকর্ম্মের অনুতাপের আগুন দাউ দাউ জ্বলিয়া উঠিয়া চোখের জলে সুখের আশার বাসা ভাসাইয়া কোন্ অজানা দেশে লইয়া ফেলিবে। জগতে ত্যাগে আনন্দ আছে, ভোগে নাই। ঠিক এই সময় গাড়ী আসিল, তিনি গাড়ীতে উঠিয়া চাপিয়া বসিলেন। গাড়ী গন্তব্যপথে ছুটিয়া চলিল। পথে যাইতে যাইতে মজুত তহবিল দেখিয়া হিসাব ঠিক করিয়াছিলেন। সে দিন কালীঘাট দর্শনাদির খরচ দুইশত সাতাত্তর টাকা তের আনা হইয়াছিল।

একবিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

ফল।

আর সহ্য হয় না। তিন দিন কাটিয়া গেল, মাসী আসিল না। বিরহ-বিকারে স্বামী আমার বড়ই কাতর হইয়াছিলেন। কাজ কর্ম্মে আদৌ মন দিতেন না। কোন কর্ম্মচারী কোন কথা বলিলে কোন কথাই শুনিতেন না। সর্ব্বদাই যেন উন্মনা, সর্ব্বদাই যেন কাহার অন্বেষণে তাঁহার নয়ন রাস্তার দিকে পড়িয়া থাকিত। তিনি দিনের মধ্যে অতি অল্প সময়ই আড়ত-বাড়ীতে থাকিতেন। এই কয় দিনের মধ্যে একদিন রাত্রি দশটার পর মাত্র বাড়ী আসিয়াছিলেন। আর সমস্ত দিন, সমস্ত সময়, সমস্ত রাত্রি বাসা-বাড়ীর সেই ক্ষুদ্র কক্ষে কাটাইয়া দিতেন।

মাসীর বাড়ীর ঠিকানা জানিতেন না। কাজেই খুঁজিয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারিতেন না। জানালা খুলিয়া তখন প্রায়ই সেই যুবতীর দর্শন পাইতেন না। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ঝগড়া কলহের শাসন সন্তাড়ন বাক্যের ভগ্নাংশ তাঁহার কর্ণে ধ্বনিত হইত। কিন্তু তাহাতে কিছুই বুঝিতে পারিতেন না।

নানারূপ কুচিন্তার উদয় হইত মাত্র। ক্রমে তাঁহার ঐ অবস্থার কথা আমার শ্বশুরের কাণে উঠিল। তিনি উহার কারণ অনুসন্ধানের জন্য চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না, তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। আমিত কিছুই জানি না, সুতরাং শ্বশুর মহাশয়কে কি উত্তর দিব। তবে আমার সৌভাগ্যক্রমে সে দিন রাত্রে তিনি বাড়ী আসিয়াছিলেন এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থাতেই আসিয়াছিলেন; সে দিন সুরা সেবন করেন নাই। কিন্তু তাঁহার চিন্তাক্লিষ্ট ম্লানমুখ ও সঙ্কুচিত চক্ষু, তাঁহার হৃদয়স্থ কষ্টের বারতা বাহিরে প্রকাশ করিয়া দিতেছিল,

তাঁহার অবস্থা ও ভাব ভঙ্গী দর্শনে আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম; তাঁহার কর্ম্মস্রোতে কোন বৈফল্যের আঘাত পড়িয়াছে। তাহাতেই কাজ কর্ম্মে ঔদাসীন্য এবং এত চিন্তা ও দুঃখের কারণ হইয়াছে, তখন কিছু বলিলাম না। যথারীতি হস্ত-পদাদি প্রক্ষালনের জল দান ও গৃহাগমনে সুশ্রূষা করিলে পর যখন তিনি গৃহমধ্যে ভোজনে বসিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,——

"তোমার কি হইয়াছে ?"

স্বামী আমার বিক্তির স্বরে মুখভঙ্গী করিয়া বলিলেন,—

"হবে আবার কি !"

আ। তোমার মুখ অত ম্লান—চিন্তান্বিত কেন ?

স্বা। আমি চিন্তান্বিত, তুমি বুঝিলে কি করিয়া?

আ। তোমার গণ্ডের কালিমা ও ললাটের শিরার সঙ্কোচন এবং চক্ষু-দৃষ্টির চাঞ্চল্যই সকলকে সে কথা বলিয়া দিতেছে।

স্বা। রাখ তোমার কবিত্ব! ব্যবসাদারি মানুষ আমরা—কবিতার মাধুর্য্যের অত খোঁজ রাখি না। ব্যবসায়ের লাভ লোকসানে বা কাজকর্ম্মের খাটাখাটির কমি বেশীতে শরীর ভাল মন্দ হয়। তাহারও কৈফিয়ৎ ঘরে আসিয়া যে আবার স্ত্রীর কাছে দিতে হইবে, ইহা জানিতাম না।

আ। কথাটা আমিই মাত্র যে বলিতেছি তাহা নহে তোমার নিকট গোপন করিব না—তুমি আমার দেবতা—দেবতার নিকট আত্মগোপনে মহাপাতক হয়। তুমি ব্যবসার কাজে অমনোযোগী হইয়াছ। সময়ে কার্য্যালয়ে উপস্থিত থাক না। তহবিল হইতে টাকা লইয়া গিয়া আর ফেরত দাও না। রাত্রে আড়তেও থাক না, বাড়ীও এস না;—বাবা ইহা জানিতে পারিয়াছেন। বাবা সন্ধানে ইহার কোন কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া আমার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আমিও 'কিছু জানি না' বলিয়া জবাব দিয়াছি। কিন্তু আমার নিকট সত্য বল, তোমার এমন হইল কেন?

স্বামী আমার মুখের দিকে ভ্রূকুটিকুটিলাননে অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কিয়ৎক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া তার পরে বলিলেন,—"ভেতরে ভেতরে আমার এক রোগ জন্মিয়া গিয়াছে।"

চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি রোগ জন্মিয়াছে?"

স্বা। যাহাকে মৃত্যু-রোগ বলে।

আ। মৃত্যু-রোগ বলিয়া কোন রোগ আছে ইহা ত শুনি নাই। নিশ্চয় ওটা রাগের কথা, আসল কথা কি বল?

স্বা। আসল কথা আর নকল কথা কি? রোগ হইয়াছে বলিলে যখন শুনিবে না, তখন আসল কথা আর কি বলিব।

আ। যদি রোগ হইয়া থাকে, ভাল ডাক্তার দেখাও, ঔষধ সেবন কর, কিছুদিন ঘরে থাকিয়া বিশ্রামে রোগ শান্তির চেষ্টা কর।

স্বা। ডাক্তারও দেখাইয়াছি, ঔষধ সেবনও করিয়াছি; কিন্তু কোন ফল হয় নাই।

আ। তবে?

স্বা। দেখি কি হয়।

সে দিন এইরূপ কথোপকথনে কাটিয়া গেল, কোন প্রকারেই আসল কথার কোন রূপ আভাস পাইলাম না। তবে পায়ে ধরিয়া অনুরোধ করিলাম, দিনে যেখানেই থাক,—যাহাই কর, রাত্রে অবশ্য অবশ্য বাড়ী আসিও। রাত্রে ভালরূপ আহার, নিদ্রা ও শুশ্রূষা না হইলে দিবসের কর্ম্মশ্রান্ত পুরুষগণ বাঁচিতে পারে না। অনেক অনুরোধ উপরোধের পর তিনি আমার প্রার্থনায় সম্মতি দান করিলেন।

অতি প্রত্যুষে উঠিয়া স্বামী মহাশয় চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিলে আমি নিষেধ করিলাম; বাড়ী হইতে আহার করিয়া দশটার সময় যাইবার অনুরোধ করিলাম, কিন্তু তিনি আমার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না। বলিলেন,—"খাবার জন্য বসিয়া থাকিলে ব্যবসায় কাজ চলে না।" কিন্তু তিনি সকালে ব্যবসায় বাড়ীতে গমন করেন নাই, সেই ক্ষুদ্র বাসকক্ষে গমন করিয়াছিলেন! নাপিত মাসী সে দিন বেলা নয়টার সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সে যখন আগমন করে, তখন তাহার মুখ-ভাব অত্যন্ত অপ্রসন্ন। সে মুখ দেখিয়া আমার স্বামী অতিশয় বিচলিত হইলেন। নাপিতিনী যখন গৃহমধ্যে আগমন করিয়া বিনা আহ্বানেই—বিনা নির্দ্দেশেই চেয়ার-খানি টানিয়া লইয়া, দরোজার পাল্লা দুইখানি ভেজাইয়া দিয়া চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িল, তখন আমার স্বামী জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি মাসী, খবর যেন তত ভাল নয়?"

"না বাবা, ভাল হলে আর এ ক'দিন আস্‌তুম না।" এই কথা বলিয়া নাপিতিনী অঞ্চলাগ্রে বার্দ্ধক্যের শুষ্ক মুখ খানি মুছিয়া ফেলিলেন। তারপরে মাসী ও মাসীর বাবুতে কথোপকথন আরম্ভ হইল।

বা। কি দুঃসংবাদ মাসী?

মা। দুঃখসংবাদ এমন কিছু না। তবে এখন কিছুদিনের

জন্য তিনি তাঁহার মামার বাড়ী থাক্‌বেন। সেই দিন কালীঘাট থেকে বাড়ী এসে রাত্রেই চলে গেছেন। নিতান্ত অনুরোধে আমাকেও যেতে হয়েছিল। আমি কাল রাত্রি দশটার সময় কলিকাতায় এসে পঁহুছিয়াছি, কিন্তু তাঁহাকে সেখানে থাক্‌তে হল।

বা। সে কোথায়?

মা। চুঁচড়া ফরাসডেঙ্গা নাম শুনেছ? সেখানে।

বা। কত দিন থাক্‌বেন?

মা। তা ঠিক্ নেই। এখন ত মাস খানেক।

বা। কেন, সেখানে কি?

মা। তাঁদের বাড়ী একটা বে ছিল। তা পরশু হয়ে গেছে। তারপর তাঁরা বল্‌লেন একচুয়রি মেয়ে—দিন কতক এখানে থাক্। মাস খানেক থাকার সম্মতি দিয়া এঁরাও চলে এলেন। আমি আর কি কোর্‌ব বল?

বা। তিনি কিছু বল্‌লেন?

মা। বল্‌লে বৈ কি। আমি আসবার আগে, গোপনে আমার কাছে কেঁদে বল্‌লে, মাসী যদি এমন কোরে ফেলে যাবে, তবে মজালে কেন—দেখালে কেন, আমি যে আর না দেখে থাক্‌তে পার্‌ব না। তুমি আমার নিতান্ত শত্রু ছিলে, তাই আমার প্রাণে এমন ক'রে দাগা দিলে। আমি যে বিমুক্তবন্ধন কিহঙ্গিনীর ন্যায় স্বাধীন প্রাণে বিচরণ করিতাম, কেন সেখানে এ

নিরানন্দের জ্বালা ঢালিয়া দিলে, এখন আমার উপায় কি মাসী ?

বাবু ধীরে ধীরে বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া অজ্ঞাতসারে অনন্যমনে ধীরে ধীরে—অতি ধীরে মাসীর দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন এবং বোধ হইতেছিল, হাঁ করিয়া মাসীর কথাগুলা গিলিতেছেন। খুব সম্ভব মাসীর কথায় আর একটু জমাটি বাঁধিলে মাসীর মুণ্ড সমেত গিলিয়া ফেলিতে পারেন। মাসীও বোধ হয় কথঞ্চিৎ তাহার আভাস পাইয়া আজীবনের দারিদ্র্য বিশুষ্ক নিতম্ব ও কলিকাতার রাস্তার প্রস্তরকঙ্করবিচ্ছিন্ন চরণ এই উভয়ের সাহায্যে বসিয়া বসিয়াই তাঁহার বসিবার চেয়ার খানি কিঞ্চিৎ হঠাইয়া লইয়া বক্তৃতার শেষ করিলেন।

তখন হতাশ প্রেমের ব্যথিত বক্ষের দীর্ঘশ্বাস অনেক খানি সেই বিছানার উপর পরিত্যাগ করিয়া করুণার্ত্তস্বরে বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তার পর মাসী ? তার পর ?"

মা। তার পর আর আমি কি করিব। কিছু বুঝাইয়া কঠিন হৃদয়ে চলিয়া আসিলাম।

বা। আমার যে সর্ব্বনাশ করিলে মাসী। আমার কাজ গেল, কর্ম্ম গেল, আহার নিদ্রা গেল, সব গেল! যদি এমন করিবে, তবে মিলাইলে কেন ? এখন উপায় কি বল ?

মা! এক উপায় আছে মাত্র।

বা। কি, বল? প্রাণ দিয়াও যদি তাহাকে মিলাইতে পার আমি তোমার হাতে তাহা দিতে প্রস্তুত আছি। যখন তাহাকে না পাইলে, আমি কিছুতে বাঁচিব না, তখন আমার প্রাণ থাকা না থাকা তুল্য কথা।

মা। দেখ তোমাদের এ বিষয় তার পিসী ঠাকুরাণী বুঝতে পেরেছেন, জান্‌লে—তিনি না বুঝতে পার্‌লে কিছু আর কালী-ঘাটে আলিপুরে তেমন স্বচ্ছন্দ দর্শন ঘটিত না। আমি আজ ভোরে এসেই তাঁর সাক্ষাতে সকল কথাই বল্‌লুম—জান্‌লে, আমি তোমার কাজে একদণ্ডও নিশ্চিন্তি নই। আমার ঘরে চা'ল নেই, ঘুঁটে নেই, বাজার করা হয় নি, একটি পয়সাও সংস্থান নেই, তবু তোমারই কাজে ছুটে বেড়াচ্ছি। ভাবলাম তার পিসীর কাছে একটা যুক্তি করিগে, আমার পেটের কথা তা জান্‌লে সে যা হয় হবে এখন।

বা। তিনি কি পরামর্শ দিলেন, শুনি?

মা। খুব ভাল পরামর্শই দিয়াছেন, জান্‌লে তিনি খুব বুদ্ধি-মতী, এখন যা হয় তোমরা বুঝে সুঝে বল? তিনি বল্লেন, ঘরের থেকে উভয়ের সাক্ষাৎ এবং মনের মত মিলন অসম্ভব। এই এক মাসের মধ্যে আনা ত যাবেই না, তারপরেও এই পাশাপাশি বাড়ী, ভদ্র-লোকের—মানী লোকের মেয়ে, তিন চারিটি ভাই, খুড়, জ্যেঠা, দাস দাসী এক পাল মেয়ে মানুষ, এদের চোখে ধূলি দিয়ে উভয়ের মিলন

অসম্ভব কথা। আমি অনেকদিন থেকে কাশী যাব বল্‌ছি, মেয়েটি আমার হাতে গড়া, আর ভাগ্যহীনা, ওকেও সঙ্গে নেব বল্‌ছি, এখন তিনটা দিনের মধ্যে যদি তাই যাই, তাকে আনিয়ে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। বাবাজীর ত পয়সার অভাব নাই। এক দুই হাজার খরচ করে ফেল্‌তে পারেন। তা হলে তাকে আনিয়ে সে, আমি, তুমি ও তোমার বোন্‌পো, চল দিন কতক তীর্থ ভ্রমণ করিগে। কিছু দিন কাশী, কিছুদিন বৃন্দাবন, কিছুদিন পৈরাগ, কিছুদিন হরিদ্বার, এই রকম দুতিন মাস ঘুরে আসা যাবে। তোমার বোন্‌-পো গিয়েছে একথা আর কেহই জান্‌বে না; আমাদের তিন জনার কথা জান্‌বে।

বাবু কয়েক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন—"উত্তম পরামর্শ। আমি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলাম, তোমরাও প্রস্তুত হও, কেবল একবার আমাকে সংবাদ দিয়া যাইবে, কোন্ দিন যাওয়া হবে।"

মা। জান্‌লে বাবা—তোমার কাজে ব্যস্ত থেকে আমার ব্যবসা কাণ্ড একদম বন্ধ হয়ে গিয়েছে—পেট চলার ভরসা তুমি। তা লজ্জা করে কর্‌ব কি। বাজার করে যাব তার কিছু খরচ দাও; আর যাওয়া যদি হয়, তবে কিছু চাল ডালের উঠনার দেনা আছি। সেটা মিটিয়ে যেতে হবে। হঠাৎ প্রয়োজনের জন্য দুই একখানা কাপড় চোপড় নিতে হবে, তারও কিছু দাম চাই, এসব তোমাকেই দিতে হবে, জান্‌লে—আর তাদেরও ঐ রকম কিছু কিছু জিনিষ পত্র কিন্‌তে হবে, তার জন্য কিছু টাকা দিতে হবে।

বা। এখনও যদি যাওয়া হয় বলছি মাসী! কাল হলে আর পরশু নয়। যে সকল জিনিষ তাঁদের নিতে হবে, তার জন্য যে খরচ হবে আমাকে যখন যে মুহূর্ত্তে বলবে, তখনই তাহা তোমার হাতে দিব। আর তোমার যা লাগবে, তা না দিলেই বা তুমি কোথায় পাবে।

মা। সে, আমি জেনে এসেছি; না না—এমন বেশী না, পঞ্চাশ টাকা তাঁদের, আর আমি ক্ষুদ্রপ্রাণী—আমার গোটা পনর; আর আজকার বাজার এই তিনটা দিনের খাবার উপযুক্ত যা হয়।

বাবু তখনই বাক্স খুলিয়া মাসীকে বাজার করিবার জন্য পাঁচটী টাকা বাহির করিয়া মাসীর হস্তে দিলেন; আর বলিয়া দিলেন, "সন্ধ্যার পরে আসিয়া তাঁহাদের ঐ পঞ্চাশ টাকা এবং তোমার পনর টাকা লইয়া যাইও। বৈকালে একবার পিসীর কাছে যাইয়া দিন স্থির করিয়া আসিবে, কবে আমাদের যাওয়া ঠিক হইবে। আমি আমার সমস্ত কাজের বন্দোবস্ত করিয়া লইব। কিন্তু আগেও বলিয়াছি, এবং পুনরায় এখনও বলিতেছি, যাইবার ব্যবস্থা কাল হইলে আর পরশু নয়।"

দ্বাবিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:৩:০—

ভোজন।

সেদিন রাত্রি দশটার পরে যখন তিনি বাড়ী আসিলেন, তখন জানিতে পারিলাম, সুরা সেবনে তাঁহার মন কিঞ্চিৎ প্রফুল্ল এবং পরিমিতপানে হস্ত-পদাদির পরিচালন স্বাভাবিক। আমি তখন তাঁহারই আগমন প্রতীক্ষায় মেঝেয় একটা মাদুর পাতিয়া শুইয়া হরিবংশের শ্রীশ্রীকৃষ্ণের জন্ম পাঠ করিতেছিলাম এবং পালঙ্কের উপর শিশু সন্তানটি শিশুজীবনের নিষ্পাপ হৃদয়ে সুখে নিদ্রা যাইতেছিল। স্বামী আমার, গৃহে প্রবেশ করিয়া বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। হস্ত-পদাদির জল যথাস্থানে রক্ষিত ছিল, তাহা লইয়া কার্য্য সম্পন্ন করিয়া আসিয়া আমার নিকট উপবেশন করিলেন; আমিও পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া বসিলাম। তিনি বলিলেন, —"এখনও ঘুমাও নাই যে? বাড়ীর আর আর সকলেই আপন আপন কক্ষদ্বার বন্ধ করিয়া ঘুমাইতেছে।"

আ! রোজই ত এই রকম হয়। তোমার আসিতে রাত্রি অধিক হয় বলিয়া, সকলেই আহারাদি সম্পন্ন করিয়া আপন আপন ঘরে গিয়ে শয়ন করেন, আমি তোমার খাবার লইয়া এই ঘরে
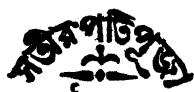
আসি এবং তোমার আগমনপ্রতীক্ষায় রাত্রি একটা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করি। তারপরে যেদিন না আইস, সেদিন নিতান্ত ক্ষুধা হইলে কিছু খাই; নতুবা যেখানকার খাবার সেইখানেই পড়িয়া থাকে; আমি খোকার পাশে গিয়া ঘুমাইয়া পড়ি। তুমি না আসিলে আমি যে সেরাত্রি কি কষ্টে কাটাই, তাহা তুমি আমার ইষ্ট-দেবতা—তুমি আমার প্রাণের ঠাকুর, তুমি আমার গুরুর গুরু তুমি বোঝ না কেন? সতীর পতিপূজা ব্যতীত জীবনের আর লক্ষ্য কিছুই নাই। তোমার সংসারের খাটুনী-খাটা, তোমার আত্মীয়স্বজনে সেবা করা, তোমার সন্তান প্রতিপালন করা,—তোমারই পূজা করা; এ অভাগিনী তাহা কিরূপে সম্পাদন করিতেছে; তাহা তুমি দেখ না কেন? তুমি সন্তুষ্ট হইলে আমার প্রতি দেবতা সন্তুষ্ট হইবেন। তোমার তুষ্টিতে ত্রিজগৎ তুষ্ট হয়। ইহা হইল তোমার গৌণ পূজা; আর তোমার পা ধোয়াইয়া স্নান করাইয়া আহার করাইয়া যে পূজা তাহা মুখ্যপূজা! তাহাতে তুমি অভাগিনীকে বঞ্চিত কর কেন? রোজ রোজ বাড়ী এস না কেন? প্রভু আমার—স্বামী আমার, আমাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিও না।

স্বামী গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"অত কথা আমার ভাল লাগে না। বোধ হয় যারা আফিসে পরের কাজ করেন, কলম ফেলিয়া আফিস ঘরের বাহির হইলে কর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ যায়, তাদেরই

ঘরে বসিয়া স্ত্রীর কাছে প্রেমের উপন্যাসের ঐরূপ বাঁধা বুলি মিষ্ট লাগে। এখন কি আছে খেতে দাও, আর আমি যা বলি শোন।

আমি তাড়াতাড়ি তাঁহার খাবারের পাত্র উন্মুক্ত করিয়া দিলাম। তিনি আহারে বসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি বলিবে বলিতেছিলে?"

স্বা। আমি কিছুদিন পশ্চিম বেড়াইতে যাইব। আমার শরীর ক্রমেই অতিশয় মন্দ হইয়া যাইতেছে;—জীবনশক্তি ক্রমেই রহিত হইয়া যাইতেছে।

আ। সেত ভাল কথা, শরীরের জন্য সব করিতে হয়। আমিও তোমার সঙ্গে যাব।

স্বা। তুমি কেন যাবে?

আ। পতির সঙ্গে সতী ছায়ার ন্যায় সর্ব্বত্র অনুগমন করিবে। আর তুমি ফাঁক দিয়া একাই তীর্থগুলি ভ্রমণ করিয়া আসিবে? আমি সঙ্গে যাইব না কেন? ঠিক যাইব।

স্বা। না, তোমাকে সঙ্গে লইতে পারিব না। তোমাকে সঙ্গে লইলে, আমার মনে শান্তি আসিবে না। শান্তি না আসিলে, শরীরও সারিবে না।

আ। কেন, আমি গেলে তোমার মনে অশান্তি আসিবে কেন? সত্যই কি তুমি আমায় দেখিতে পার না?

স্বা। দেখিতে পারা না পারার কথা স্বতন্ত্র। ফল কথা
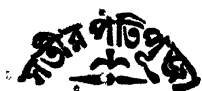
স্ত্রীলোক সঙ্গে লইয়া বিদেশ যাওয়াতে আমি রাজী নহি। ওসব কথা তুলিও না; নিশ্চয় জানিও আমি তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইব না।

অভিমানে আমার মনে কেমন ক্ষোভের উদয় হইল, দুঃখের ঘন মেঘচ্ছায়ার যেন সমস্ত হৃদয় ঢাকিয়া পড়িল, আমি আর কোন কথা বলিতে পারিলাম না। সেদিন সেইখানেই সে সকল কথার আন্দোলন আলোচনার পরিসমাপ্তি হইয়া গেল।

ইহার তিন দিন পরে একদিন দ্বিপ্রহরের সময় স্বামী বাড়ী আসিলেন। এমন সময় বিশেষ কার্য্য না পড়িলে কখন ও বাড়ী আসেন নাই। কারণ আমাদের আড়ৎ-বাড়ীতেও কর্ম্মচারী ও পাইকেরগণের আহারাদির জন্ম রন্ধনাদি হইয়া থাকে। রাত্রে বাড়ী আসিয়া আহারাদি করেন এবং সকালে উঠিয়া কোন দিন নটার সময় বাড়ীতে আহারাদি করিয়া সেখানে যান, আর যেদিন আহার না করিয়া যান, সে দিন সকালেই যান এবং সেইস্থানে মাধ্যাহ্নিক ভোজনাদি সম্পন্ন করেন। আজ প্রত্যুষেই গমন করিয়াছিলেন, মধ্যাহ্নে ফিরিয়া আসায় বুঝিতে পারিলাম, বিশেষ কোন কাজ আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম,—"কি কাজের জন্ম এখন বাড়ী আসিলেন?"

স্বা? পশ্চিম যাইব, তাহারই কিছু জিনিষপত্র লইতে আসিয়াছি।

আ। কবে যাইবেন ?

স্বা। আজ সন্ধ্যার পর।

আ। কবে আসিবেন ?

স্বা। তা এখন ঠিক করিয়া কি করিয়া বলিতে পারি।

আ। এদিকে কাজ কর্ম্মের কি ব্যবস্থা করিলেন ? সম্মুখে পাটের আমদানীর সময়—এই সময় সম্বৎসরের ব্যবসায়। আপনি চলিয়া গেলে কাজ কর্ম্ম নষ্ট হইবে না ?

স্বা। যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যাইতেছি, তাহাতে কাজ অচল না হইতে পারে, তবে কিছু যে মন্দ হইবে না, এ কথা বলা যায় না। কিন্তু আমার শরীর যেরূপ দিন দিন খারাপ হইয়া যাইতেছে; তাহার তুলনায় কাজ বড় বেশী নয়। আপনি বাঁচিয়া থাকিলে তবে ধন দৌলত, ব্যবসায়, বাণিজ্য বা স্ত্রীপুত্রাদি সব।

আ। তোমার এখন প্রধান ব্যাধি কি ?

স্বা। বিশেষ ব্যাধি কি, বলিতে পারি না ; তবে ব্যাধি যে হইয়াছে ইহা নিশ্চয়। আর কিছুদিন পশ্চিম না গেলে মরিয়া যাইব তাহাও নিশ্চিত।

আ। দেখ, তোমার যে কোন কথায়ই আমার যেন সন্দেহপূর্ণ বলিয়া জ্ঞান হয়। বলিতে কি, মনে হয় আমাকে তুমি আসল কথা গোপন করিয়া মিথ্যা বলিয়া ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতেছ ! যেদিন তুমি প্রথম বলিয়াছ পশ্চিম যাইবে—আর আমাকে

লইয়া যাইতে স্বীকৃত হও নাই, সত্য বলিতেছি, সেইদিন হইতে আমার মনে হয়, আমার স্বামী দেবতা,—আমার আশ্রয়তরু আমাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন ; আমার প্রাণের প্রদীপ, আমার জ্ঞানচক্ষুর দূরবর্ত্তী হইবেন। তুমি আমার সন্দেহ মিটাইয়া দাও—নিশ্চয়ই আমার এই ধারণা, এই চিন্তা মিথ্যা। আমি এই চিন্তা করিয়া তোমার নিকট শত অপরাধে অপরাধিনী হইয়াছি। তুমি আমার মহাগুরু। গুরুর কথা শ্রীগোবিন্দের আদিষ্ট বাক্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

স্বা তাহা আমি পারিব না। তোমার সত্য মিথ্যা তুমি জান, আমার সত্য মিথ্যা আমি জানি। আমার সুবিধা বুঝিয়া চলিলাম, আবার যখন সুবিধা বুঝিব, তখন আসিব, ইহাতে কি সন্দেহ তোমার হইতে পারে না পারে আমি জানি না। ব্যবসাদার মানুষ, সত্য মিথ্যার অত ধার ধারি না।

তিনি কি একটা কর্ম্মের জন্ম বাহিরে চলিয়া গেলেন। আমি গৃহমধ্যে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। প্রথম চিন্তা এই উদয় হইল যে—কেন চিন্তা করি ; তিনি পুরুষ মানুষ, ব্যবসায় কার্য্যের বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়া নিজের শরীর সারিবার জন্ম বিদেশে যাইবেন, শরীর সারিলে ফিরিয়া বাড়ী আসিবেন ; ইহাতে আমার মন বিচলিত হইবে কেন ! এ 'কেনর' উদয় হয় বুঝি তাঁহার চরিত্র হইতে। তাঁহার চরিত্রে দোষরাশি প্রবেশ করিয়াছে বলিয়া মনে

সন্দেহের উদয় হয়-বুঝি কোন পাপিনীর—বুঝি কোন পিশাচীর—বুঝি কোন কুহকিনীর কুহকমন্ত্রণায় মুগ্ধ হইয়া স্বামী আমার বিদেশ ছুটিতেছেন? প্রাণপণে মন হইতে সে চিন্তাকে দূর করিবার জন্য তাহার বিপরীত চিন্তাকে টানিয়া আনিলাম। চিন্তা করিলাম, কলিকাতার বারবিলাসিনীগণের বিলাসভবনেই তাহাদের সমস্ত কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা ইঁহাকে টানিয়া লইয়া পশ্চিম যাইবে কেন? কিন্তু এই বিপরীত চিন্তা প্রথম চিন্তার নিকট দাঁড়াইতে পারিল না। প্রথম চিন্তা তাহাকে ঢাকিয়া ফেলিয়া উচ্চগলায় বলিয়া উঠিল, তাহাদের কত লীলা, কত ভাব, কত তত্ত্ব আছে, তুমি কুল-মহিলা, তার সন্ধান কি জান? দ্বিতীয় চিন্তা ক্ষীণস্বরে এই তত্ত্বের উত্তর করিল যে—তা স্বীকার করি বটে, কিন্তু আমার স্বামী বাড়ী থাকিয়া, কাজকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াও যখন তাঁহাদের সহিত মিশিয়া অধঃপাতের পথে বিচরণ করিতে বাধাপ্রাপ্ত হইতেছেন না, তখন এ সকল পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন কেন? প্রথম চিন্তা মরণের ক্ষীণার্ত্ত স্বরে বলিয়া উঠিল—তোমার স্বামীর অধঃপতন বুঝি এখানে সম্পূর্ণ হইতেছে না। সেই অপূর্ণকে পূর্ণ করিবার জন্যই কোন পাপিনী তাহার পাপ বাহুর বন্ধনে বাঁধিয়া উঁহাকে দিক্ হইতে দিগন্তে বিতাড়িত করিয়া লইয়া চলিয়াছে।

তখন আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল। সত্যই কি আমার
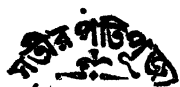
স্বামী অধঃপাতে যাইবেন। সত্যই কি তিনি পাপহৃদয়ের প্রতপ্ত আকাঙ্ক্ষা লইয়া কোন পিশাচীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছেন। এই সময় আমার স্বামী বাহির হইতে বাড়ীর ভৃত্যকে ডাকিয়া গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং একটি ষ্টিলের বাক্স বাহির করাইয়া তাহাতে তাঁহার আবশ্যকমত কতকগুলি কাপড়, জামা, তোয়ালে রুমাল প্রভৃতি তুলিয়া লইয়া ভৃত্যকে গাড়ী ডাকিতে আদেশ করিলেন। তখন আমার স্বামী মায়ের নিকট গিয়া পশ্চিম যাইবার কথা প্রকাশ করিলেন। মা শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন এবং পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিলেন, কিন্তু কাহারও নিষেধে কোন ফল হইল না, এই সময় গাড়ী আসিয়া দরজায় দাঁড়াইল, তিনি ভৃত্যকে দিয়া বাক্সটি গাড়ীর উপর তুলাইয়া লইলেন এবং গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ী হাঁকাইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার কথামত আমরা ভাবিয়াছি তিনি তখনও বড়বাজারের আড়ৎ-বাড়ীতে গমন করি-বেন, এবং তথা হইতে রাত্রের যে কোন সময় হাওড়ার ষ্টেশনে গিয়া পশ্চিম যাইবার যে কোন গাড়ীতে আরোহণ করিবেন।"

আমি বসিয়া বসিয়া এক মতলব আঁটিলাম। বৈকালে বাড়ীর ভৃত্যকে হাওড়া ষ্টেশনে পাঠাইয়া দিব। সে গিয়া কোন একটু লুকান স্থানে বসিয়া থাকিবে। রাত্রি দ্বিপ্রহর পর্য্যন্ত এইরূপ থাকিলে ইহার মধ্যে কোন না কোন সময় আমার স্বামী অবশ্যই পশ্চিম যাইবার জন্ত সেখানে উপস্থিত হইবেন এবং যদি কোন

পিশাচী তাঁহার সঙ্গ লইয়া থাকে, তাহা হইলে সে দেখিয়া আসিতে পারিবে। কিন্তু আমার সে মতলব ব্যর্থ হইয়া গেল। বৈকালেই সংবাদ পাইলাম, তিনি সেই যে সকালে বাড়ী আসিয়াছেন, আর দোকানে যান নাই,—বাসাগৃহেও যান নাই,—সেখানকার চাবি-কাটি সকালে আড়ত-বাড়ীর কর্ম্মচারীর হাতে দিয়া আসিয়াছেন। তখন বোঝা গেল, অভুক্তাবস্থাতেই মধ্যাহ্নের যে কোন গাড়ীতে তিনি তাঁহার গন্তব্যস্থানাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে সকলেই বিশ্বাস করিল, কোন পাপিনী তাঁহার সঙ্গ লইয়াছে। সংবাদ পাইয়া আমার বড় কষ্ট হইল। এ কষ্টের কথা কি করিয়া ব্যক্ত করিতে পারি, তাহার ভাষা আমার জানা নাই। উপমা আমি খুঁজিয়া পাইলাম না! তবে এইমাত্র বলিতে পারি, মেঝেয় পড়িয়া অনেকক্ষণ হাপুষনয়নে কাঁদিতেছিলাম। আর দুই একবার তাঁহাকে ডাকিয়া অনুচ্চ-চীৎকারে গৃহখানিকে মুখরিত করিয়াছিলাম। আমার অধিক জ্ঞান ছিল না, আমার শাশুড়ী দুই তিনবার গৃহে আসিয়া আমার মাথায় জল থাবাইয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। স্বামীর কোন পত্র আসিল না,—কিছুমাত্র সংবাদ মিলিল না, তখন বোঝা গেল আমাদের অনুমান সত্য,—সত্যই তিনি কোন পিশাচীর সঙ্গী হইয়া কলিকাতা ত্যাগ করিয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা ত্যাগ করিবার হেতু কি! কলিকাতার বারবিলাসিনীদিগের পাপভবনে নানাবিধ
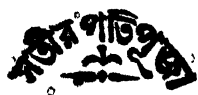
পাপের লীলাখেলা সংঘটন হইয়া থাকে। তিনি যেখানে গমনাগমন করিয়া থাকেন, হয়ত সেইস্থানে ঐরূপ কিছু ঘটিয়া থাকিবে—হয়ত অপরের দোষ এখন তাঁহার স্কন্ধে চাপিয়াছে, তাই তিনি পুলিশ বা অপর কোন লোকের চক্ষে ধূলি দিবার জন্য কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন। এ সকল কার্য্যের রহস্যবিৎ ব্যক্তি এই মতের উদ্ভাবনা করিলেন।

শুনিয়া তাঁহার অপাপবিদ্ধ হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল, আমার শ্বশুর চিরকালের ব্যবসাদার—চিরকালের ভালমানুষ, কখন পুলিষ হাঙ্গামা জানেন না। ঐ কথা শুনিয়া তিনি কাঁপিয়া উঠিলেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে তিনি তাঁহার পুত্রকে—চিরস্নেহের সন্তানকে কি করিয়া রক্ষা করিবেন! সে দিবস আমাদের বাড়ীর কাহারই আহারাদি ভাল করিয়া হইল না, কাজকর্ম্ম একরূপ বন্ধই রহিয়া গেল। একবার মাত্র শ্বশুর বড়বাজারের আরৎ-বাড়ীতে গমন করিয়াছিলেন,সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়া আমাদিগকে বলিলেন, এ কয়দিন ধরিয়া, সে থোকা থোকা যে টাকা লইয়াছে,তাহার মোট সংখ্যা প্রায় দুই হাজার; আর গতকল্য হইতে পাইকেরদের দরুণ যে টাকা পাওনা ছিল, তাহার এক পয়সাও হিসাবে জমা না দিয়া সমস্তই লইয়া চলিয়া গিয়াছে। কলে জানিয়া আসিয়াছে, প্রায় তিন হাজার টাকা পাওনা ছিল। বর্ত্তমানে তহবিল প্রায় শূন্য এই বৃদ্ধবয়সে চারিদিক দিয়াই আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত।

আমার দেওর শ্বশুরকে প্রবোধ দিয়া ধৈর্য্য অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিল। যে কোন প্রকারেই হউক কার্য্য চালাইতে হইবে এবং তাঁহার অনুসন্ধান করিয়া বাড়ী ফিরাইয়া আনিতে হইবে। হতাশ হইলে—কাঁদিলে কাটিলে অসুবিধা বৈ সুবিধা হইবে না। শ্বশুরমহাশয় বৃদ্ধকালে অতিশয় ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিলেন, তিনি বলিলেন,—"এখন পাটের সময় টাকা হাতে না থাকিলে কাজ চালাইবে কি প্রকারে?"

দেওর আমার মুখের দিকে চাহিলেন। আমি বলিলাম,—"কাজ যাহাতে চলে করিতেই হইবে। আমার গায়ের গহনাগুলি আছে উহা বিক্রয় করুন। কত মূল্য হইতে পারে?

শ্বশুরের চক্ষু দিয়া অশ্রুবিন্দু গড়াইয়া বার্দ্ধক্যের লোলগণ্ড প্লাবিত করিল। তিনি দীর্ঘশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন,—"হাঁ গোবিন্দ! আমি জীবিত থাকিতেই আমার বধূমাতার গায়ের গহনা বেচিয়া খাইতে হইবে!"

আমি বাধা দিয়া বলিলাম,—"সে কি বাবা! অলঙ্কার বেচিয়া টাকা খাইতেছেন কোথায়? ব্যবসাদার লোকেরা সময়ে গহনা গড়াইয়া রাখে এবং কোন কারণে মূলধনের টাকার প্রয়োজন হইলে, হয় বন্দক দিয়া নয় বিক্রয় করিয়া টাকা লইয়া কার্য্য চালাইয়া থাকে। লাভ হইলে পুনরায় দ্বিগুণ করিয়া থাকে। তাহাতে আপনি দুঃখ করিবেন কেন?"
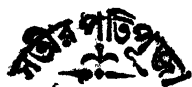
কম্পিতকরে কোটর চক্ষুর অশ্রু মুছিয়া বক্ষবিচ্যুত বেদনার নিঃশ্বাস টানিয়া বাহিরে ফেলিয়া রুদ্ধকণ্ঠের আর্ত্তস্বরে শ্বশুরমহাশয় বলিলেন,—"তুমি আমাকে বুঝাইয়া দিবে, আর আমি বুঝিব, আমার কি তেমনই বয়স মা! আমি ঐ কাজ করিয়া এই কলিকাতার সহরে চুল পাকাইয়া শণের নুড়ি করিয়াছি। সে হতভাগ্য যদি বুকের রক্ত জল করা, সঞ্চিত অর্থ লইয়া অসৎকার্য্যে ব্যয় না করিত, যদি ব্যবসায়ের পুঁজির জন্য টাকার প্রয়োজন হইত, আর তুমি গহনা খুলিয়া দিতে, আমার দুঃখের কোন কারণই হইত না; আর এ কি হইতে বসিয়াছে বৌমা! সে হয়ত কোন রাজকীয় অপরাধ করিয়াছে,—তাই রাজকীয় পুরুষগণ, জঙ্গলস্থ হিংস্রক জন্তুকে যেমন ব্যাধগণ তাড়াইয়া ফিরে, তেমনিই তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ ফিরিতেছে, আর সে দুই হস্তে সেই সঞ্চিত অর্থ বিতরণ করিয়া ক্ষিয়ৎক্ষণের জন্য আত্মরক্ষা করিয়া দূর হইতে দূরান্তরে ছুটিয়া চলিয়াছে। আর আমি? আমি বার্দ্ধক্যের আবদ্ধ চরণে স্থবিরতা নিবন্ধনে গৃহকোণে বসিয়া বধূমাতার গাত্র-অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া লইয়া তাহা বিক্রয় করিয়া এখনও ব্যবসায় চালাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। তাহার বিপদ্ বিনাশের জন্য যাইবার আমার উপায় নাই। আমি গতিহীন, বৃদ্ধ,—কোথায় যাইব, কি করিব? কোন্ বুদ্ধির বলে তাহার গতিপথ সন্ধান করিয়া তাহার দেখা পাইব? এদিকে ব্যবসায় কার্য্যে শত শত লোককে বুঝাইতে হইবে, হিসাব

দিতে হইবে, মিষ্টকথায় তুষ্ট করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে দুপয়সা আদায় করিতে হইবে। সে সকল জানা থাকিলেও শক্তি আর বিন্দুমাত্র নাই! বৌমা! আমি জীবিত থাকিতে আমার সম্মুখে—আমার সাজান বাগানে, যে এমন করিয়া আগুন লাগিবে, ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই।"

আমার শ্বশুরের তখনকার অবস্থা ও কথাগুলি বলিবার ভঙ্গি এবং কণ্ঠস্বর শুনিয়া বুঝি কঠিন দেওয়াল দরজাগুলাও ফাটিয়া যাইতেছিল। আমরা সকলেই কাঁদিতেছিলাম, কিন্তু আরও অস্থির হইবেন, এই জন্য সকলেই ধৈর্য্যের দৃঢ় বন্ধনে হৃদয় আবদ্ধ করিয়া কেবল তাঁহাকেই প্রবোধ দিয়া স্থির করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, আমি বলিলাম,—"তাঁহার যে রাজকীয় বিপদ ঘটিয়াছে, ইহা আমাদের অনুমান মাত্র। সত্য সংবাদ মিলে নাই,—হয়ত আমাদের অনুমান মিথ্যা; তিনি তাঁহার পাপকার্য্যের অধিকতর পরিচালনে, অধিকতর সুখলাভ করিবেন বলিয়া, কোন পিশাচীকে সঙ্গে লইয়া কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছেন।"

শ্বশুর মহাশয় একটু চিন্তা করিয়া তদুত্তরে বলিলেন,—"না বৌমা; সে তত আহাম্মক নয়, যে আড়তের এত টাকা নষ্ট করিয়া কলিকাতা ত্যাগ করে। আজীবন প্রত্যহই একার্য্য করিতেছে। কিন্তু কখনও সে সারারাত্রি কোথাও কাটায় না, যে এতদিন সংযমের বলে এমন করিয়া আসিয়াছে, সে যে হঠাৎ আমাদিগকে

ত্যাগ করিয়া,—ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহা বিশ্বাস হয় না। আর তাহা হইলে আজ সপ্তাহ ধরিয়া প্রত্যহই তাঁহার টাকার দরকার হইত না। প্রথম বিপদ্গুলি ঐরূপ টাকা দিয়া মুছিয়া আসিয়াছে, যতক্ষণ পারিয়াছে, এখানে থাকিয়া আত্মরক্ষার জন্য ঐগুলি ব্যয় করিয়াছে। তারপরে যখন অপারগ হইয়াছে, তখন আমাদের মায়া কাটাইয়া, ব্যবসায়ের আকর্ষণ মুছিয়া, কিছু টাকা সঞ্চয় করিয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে।

সহকারচ্যুতা লতার উপরে একসঙ্গে অনেকগুলি লোক ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলে, তাহার যেমন সমস্ত অংশ ছিন্ন, ভিন্ন, দলিত-মথিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া যায়, শ্বশুর মহাশয়ের এই কথাতে আমারও তেমনই দেহের সমস্ত অংশ তেমনই ভাবে দলিত-মথিত ও চূর্ণীকৃত হইয়া গেল। মনে হইল, আমি এখনই আত্মহত্যা করি। আর সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু আমার এই বৃদ্ধ শ্বশুরের উপায়? তাঁহার পিতা! আমি যদি এখন আত্মসুখের জন্য প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে তাঁহার পিতার সেবা না করিলে আমার কর্ত্তব্যকার্য্যের ত্রুটি হইবে। আমি কিয়ৎক্ষণ মৌনমুগ্ধ থাকিয়া অবশেষে বলিলাম,—"আপনি আমাদের আশ্রয় তরু;—আশ্রয়তরু বিচলিত হইলে, তাঁহার আশ্রিত সকলে অত্যন্ত বিচলিত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়ে। এ বিপদে আপনাকে ধৈর্য্য ধরিতে হইবে,—অলঙ্কার আপনি দিয়াছেন, প্রয়োজন মত আপনি লইবেন, আবার

হইলে আপনি দিবেন, ইহার জন্য ক্ষোভের কারণ কি? ঠাকুর-পো আছেন, উনিও ব্যবসা-কার্য্য শিখিয়াছেন, দেখিয়া শুনিয়া কাজ করুন, আর বিশেষরূপে সন্ধান লইতে থাকুন, তিনি কোথায় গিয়াছেন। আমি মেয়েমানুষ, আমি কি প্রকারে জানিব, সে সন্ধানের পথ কোথায়। যাহারা এসকল বিষয় জানেন শোনেন, এমন কোন এক অভিজ্ঞব্যক্তিকে অনুসন্ধানের ভার দিন এবং তাঁহাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিতে স্বীকৃত হউন। দেখিবেন সকল দিকৃই রক্ষা পাইবে, নতুবা গোলযোগ করিলে—হতাশ হইলে; সবদিকৃই নষ্ট হইয়া যাইবে।

শ্ব। তোমার গহনা বিক্রয় করিতে পারিব না—বড় জোর, বাঁধা দিয়া দু হাজার টাকার গহনাতে দেড় হাজার টাকা লইতে পারিব, তাহাতে কি হইবে। এখন মরশুমি সময়, এ সময় যাহা ছিল এবং এখন আমাদের ব্যবসায় কাজে যতটুকু উন্নতি হইয়াছে, তাহাতে আরও কিছু ঋণ না থাকিলে কাজের সুবিধা হইত না, কিন্তু মূলে ধ্বংস হওয়াতে অনেক টাকার অভাব পড়িয়া গেল।

আ। না হয়, ঋণের পরিমাণ আরও কিছু বাড়িবে।

শ্ব। তবেই ত গহনা বাঁধা দিয়াও ঋণ, সেও ঋণ, এই সব ঋণের সুদ দিতেই যাহা লাভ হইবে সব যাইবে।

আ। শ্রীগোবিন্দের যাহা ইচ্ছা, তাহাই হইতে দিন। তা বলিয়া ব্যবসায়ের সঙ্কোচ করা হইবে না। এক বৎসর কাজ

করিয়া দেখিয়া যদি অসুবিধা হয়, তখন যেমন বুঝিবেন তেমনই করিবেন। আমার মনে হয় এইবার আমাদের ব্যবসায় কাজে এত লাভ করিতে পারিব, যাহাতে আমাদের সুদ ও লোকসান পোষাইয়া আরও প্রচুর মূলধন রহিয়া যাইবে।

শ্ব। এ বিবেচনা তোমার কোথা হইতে আসিতেছে মা? যদি আমার সেই ভাগ্যই হইত, তবে এ বৃদ্ধ বয়সে এরূপ অবস্থায় পড়িতাম না। সমস্ত জীবন সাবধানতায় স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া, নিষ্পাপের শান্তিতে অতিবাহিত করিয়া, সেই হতভাগার পাপমতি ধরিবে কেন? আর সেই মহাপাতকের প্রবল আগুনের তাপে আমার শান্তির সংসার এমন করিয়া দগ্ধ হইয়া যাইতে বসিবে কেন?

আ। দেখুন, সুখ দুঃখ পরিবর্ত্তনশীল, আপনি পুণ্যবান্, আপনার পুণ্যে সংসার এতদিন নিরবচ্ছিন্ন শান্তিতে অতিবাহিত হইয়াছে; আর আমরা এখন পাঁচজন পাঁচ রকমের অদৃষ্ট কর্ম্ম লইয়া আপনার সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছি। আমাদের মহাপাতকের আগুন আপনাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। আপনি আবার আপনার পুণ্যময় প্রাণে দিনকতক শ্রীগোবিন্দকে ডাকিয়া কাজ করিলে, নিশ্চয়ই ব্যবসায়ে উন্নতি লাভ করিতে পারিবেন। তাই বলিতেছিলাম, এবার আমাদের প্রচুর লাভ হইবে।" কারণ এই দুঃখে পড়িয়া—অভাবের এই জ্বালায় ঠেকিয়া আপনি তাঁহাকে
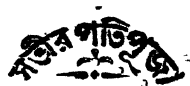
প্রাণপণে ডাকিলে, তিনি না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। দয়াল ভগবান্,—যে কাজে তাঁহার দয়া প্রার্থনা করিবেন, সেই কাজেই তাঁহার দয়া মিলিবে; এ ধারণা আমার নিশ্চিত।

আমার শ্বশুর মহাশয় সে কথার কোন উত্তর করিলেন না, কেবল একবার করুণ নয়নের ক্ষণিক দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিলেন মাত্র। সেদিন সে সম্বন্ধে আর কোন কথাই হইল না।

ত্রয়োবিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

আসন।

তাহার পর আট মাস অতীত হইয়া গেল। এতদিনের মধ্যে সুখ দুঃখ অভাব ও অভিযোগের মধ্যে পড়িয়া আমরা অতিশয় কষ্ট পাইয়াছি। আমার স্বামীরও কোন সংবাদ মিলে নাই।

নিত্য সন্ধ্যাকালে, যখন নিদাঘের স্বচ্ছ চন্দ্রমণ্ডল আকাশের এক পার্শ্বে উদিত হইত, আর তাহার শীতল আলোকতলে আমাদের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণের টবের উপরিস্থ বেলার কুড়িগুলি আবেশ-বিহ্বলে ফুটিয়া পড়িত, মনে হইত! হায়, এ কত সুখস্পর্শে ফুটিয়া পড়িতেছে। এ সুখ বৈকুণ্ঠের না গোলোকের,—মনে হইত তুমি কি আসিবে না? তুমি কোথায় গিয়াছ? কি অপরাধে আমাদিগকে ভুলিয়া গেলে? আমি তোমার চরণতলে কি এমন অপরাধ করিলাম, যে রমণী-জীবনের যাহা সার—রমণীর যাহা জীবনের ভোগ্য—রমণীর যাহা তপস্যার শ্রেষ্ঠতম ব্রত—রমণীর যাহা সর্ব্ব দেবতার সমষ্টি, তাঁহার পূজাই যাহার মহাপূজা, তাহা হইতে আমাকে কেন বঞ্চিত করিলে? প্রভু! আমি যে নিত্য আমার দেহাদি যাহা কিছু আছে, সর্ব্বস্ব লইয়া তোমার অপেক্ষায় বসিয়া আছি। তুমি

গ্রহণ করিবে না কেন? এস প্রভু! এস রমণীর শ্রেষ্ঠদেবতা! কিন্তু কেহ আসিত না। কেহ সাড়া দিত না। কেবল তাঁহার অনুসন্ধানে যাহাকে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, কাশী, গয়া ও শ্রীবৃন্দাবনাদি সমস্ত তীর্থ ও প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানগুলি অনুসন্ধান করিয়াও সে কোন প্রকার সন্ধান করিতে না পারিয়া কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল; যদিও তিন চারি মাস তাহাকে বেতনভোগী ভাবেই রাখা হইয়াছিল, তাঁহার ভ্রমণের সমস্ত অর্থ বহন করিয়া তিন চারি মাসের পর তাহাকে অবকাশ দেওয়া হয়—তথাপি তাহাকে বলা ছিল, সন্ধান করিতে পারিলে প্রচুর পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আজ বৈকালে হঠাৎ তাহার এক সুদীর্ঘ পত্র পাইয়াছি, গৌহাটী হইতে পত্র আসিয়াছে। সেখানে সে যাহাকে পাইয়াছে, অদ্যই সে আমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়া লিখিয়াছে।

আ। শ্রীগোবিন্দের কৃপা।

ঠাকুর-পো আমার মুখের দিকে চাহিয়া এবং অঙ্গ-ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল। স্পষ্ট বলিল—"বৌ দিদি, এ কি! আমি আশা করিয়াছিলাম, এই সংবাদটিতে তুমি অত্যন্ত অধীরোৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এবং আমাকে অতিশয় ব্যস্ত ভাবে সমস্ত কথা জিজ্ঞাসা করিবে ও যাইবার জন্য অনুরোধ করিবে, কিন্তু তেমন ত বুঝিলাম না।

আমি কাষ্ঠের হাসি হাসিয়া বলিলাম,—"না দাদা, সেদিন

নাই, দুঃখ কষ্টের ঘোরাবর্ত্তনে পড়িয়া বুঝিতে পারিয়াছি, শত চেষ্টাতেও মানুষ এখানে কিছু করিতে পারে না; শ্রীগোবিন্দের কৃপা ব্যতিরেকে কিছুই হয় না। ক্ষুদ্র আমি—অধম আমি,—লাফাইয়া ঝাঁপাইয়া কি করিব? থাক্, এখন তোমার দাদার সম্বন্ধে কি খবর পাইয়াছ বল?"

সে ততক্ষণ ঘরের মধ্যে যাইয়া একটা আলো টানিয়া আনিয়া আমার পার্শ্বে রকের উপর রাখিয়া পকেট হইতে একখানা পত্র বাহির করিয়া পড়িতে বসিল, তাহাতে লেখা ছিল—

যদিও আমি বর্ত্তমানে আপনাদের বেতনভোগী অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী ছিলাম না, তথাপি আমি অবসরকালে সে কার্য্যে বিরত হই নাই। মধ্যে একদিন আপনাদের বাসা বাড়ীর দরজার সম্মুখে ফুট পাথ দিয়া চলিয়া যাইতেছিলাম, এমন সময় একটি ভদ্রলোক সেই বাড়ী হইতে বাহির হইয়া আমি যেদিকে তখন যাইতেছি, তিনিও সেই পথ ধরিলেন, বুঝিলাম যেদিকে আমি যাইব, তিনিও সেই দিকে যাইবেন। সুবিধা পাইয়া আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—"মহাশয় এই বাড়ীতে কতদিন আছেন?"

ভদ্রলোকটি বলিলেন,—"কেন মহাশয়? চারি পাঁচ বছর আমি এ বাড়ীতে আছি।

আ। একটু প্রয়োজন আছে বলিয়াই হয় ত আপনার বিরক্তিজনক কয়টী কথা জিজ্ঞাসা করিতে হইতেছে। ভরসা

করি, আমাকে তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন।" ভদ্রলোকটি পশ্চাৎ ফিরিয়া আমার দিকে একবার চাহিয়া যেমন চলিতেছিলেন, তেমনই চলিতে চলিতে বলিলেন,—"আপনি পুলিশ কর্ম্মচারী নাকি ?"

আ। না সে সন্দেহ আপনি করিবেন না। নিশ্চয়ই আমি পুলিশ কর্ম্মচারী নহি, আমি একজন সাধারণ ভদ্রলোক মাত্র।

ভ। কি বলিতেছিলেন ?

আ। জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম,—আপনারা যে বাড়ীতে বাস করেন ঐ বাড়ীর উত্তর দিকের শেষ ঘরটিতে যাহারা বাস করেন, সেই ঘরের বাবুর সহিত আপনার আলাপ ছিল কি ?

ভ। ছিল।

আ। কয় মাস ধরিয়া তাঁহার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। তাঁহার বিরুদ্ধে কোন অপরাধজনক ঘটনার কথাও কলিকাতা সহরে বা কোথা হইতেও শুনা যায় না। তীর্থ স্থানাদিতেও সবিশেষ সন্ধানে তাঁহার খবর মিলাইতে পারি নাই, লোকটা গেল কোথায় ইহা বুঝা গেল না। আমার জ্ঞান হয়, মেয়েমানুষ-ঘটিত কোন অপরাধ ইহার মধ্যে নিহিত আছে।

ভদ্রলোকটি যাইতে যাইতে গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—আমরা প্রথম প্রথম তাঁহা মনে করিয়াছিলাম, এই বাড়ীর সংলগ্ন একটি বাড়ীতে একটি সুন্দরী বাস করে, মনে করিয়াছিলাম তাহাকে

লইয়াই ঐ যুবক পলায়ন করিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। সে যুবতী অতিশয় ধার্ম্মিকা এবং বাড়ী হইতে এক দিবসের—এমন কি মুহূর্ত্তের জন্যও স্থানান্তরে যায় নাই। তার পরে আশে পাশে অনেক বাড়ীতে খোঁজ করিয়া দেখিয়াছি, কোথা হইতেও সেরূপ সংবাদ আসে নাই।

আ। লোকটা কোথায় এবং কি জন্য চলিয়া গেল, তাহা আজ আট মাসের মধ্যে কিছুতেই সন্ধান করিতে পারিলাম না, সে চরিত্রহীন ছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান গমনের সহিত তাহারও কোন সম্বন্ধ সংঘটন নাই। তাহার যে সকল পাপকার্য্যের বন্ধু-বান্ধব আছে, সে সকলেই যথাস্থানে বিরাজ করিতেছে; কেহ একদিনের জন্যও কোথাও যায় নাই। যে সকল বার-বিলাসিনীর ভবনে গমনাগমন করিত বলিয়া জানা ছিল, এমন কি একরাত্রির জন্য যেখানে বসিয়াছে, অনুসন্ধানের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেখানেও দেখিয়াছি, সকলেই যেমন ছিল, তেমনই আছে। কোন সূত্রেই তাহার গমনের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য পথের অনুসন্ধান স্থির করিতে পারিলাম না!

ভদ্রলোকটি এই সময় বাঁয়ের দিকের রাস্তায় ও আমি দক্ষিণের রাস্তায় উঠিলাম; তিনি কিয়দ্দূর যাইয়া আমাকে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, আমি একটু দ্রুতপদে তাঁহার নিকট ফিরিয়া গেলে, তিনি আমাকে বলিলেন,—"দেখুন মহাশয়, আপনাকে

একটা কথা বলিয়া দিই, যদি সেই সূত্র ধরিয়া এই ব্যাপারের অনুসন্ধান করিতে পারেন।

আ। বলুন না মহাশয় ;—সামান্য একটু সূত্র পাইলেই আমি পারি

ভ। "একটি নাপিতিনীকে মধ্যে মধ্যে তাঁহার এখানে আসিতে দেখিতাম। তাহারা চলিয়া যাওয়ার পর ঐ মাগীকে আমরা আর দেখিতে পাই নাই, নাপিতিনী বলিয়া এই জন্য নির্দ্দেশ করিতে পারি, সে যে দিন বৈকালে আসিত, সে দিন তাহার সঙ্গে তাহার ব্যবসায় কার্য্যোপযোগী দ্রব্যাদি থাকিত। সে আমাদের বাসা-বাড়ীর আশে পাশে চারিদিকের বাড়ীর মেয়ে কামাইত। কিন্তু এই আট মাসের মধ্যে এদিকে আর তাহাকে দেখি নাই।"

আমি উৎফুল্ল হইলাম। আমার যেন মনে হইল, এই সূত্র লইয়া নিশ্চয়ই আমি তাহার অনুসন্ধান করিতে পারিব। তার পরে উভয়ে উভয়ের গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম।

পর দিবস সকালে উঠিয়া তাহাদের বাসা-বাড়ীর পশ্চাদ্ভাগে যে বাড়ী, সেই বাড়ীর দরজায় গিয়া কড়া ধরিয়া নাড়া দিলাম। অনেকক্ষণ কড়া নাড়িবার পর দরজা খুলিয়া গেল এবং একটি অষ্টম কি নবমবর্ষীয়া সুন্দরী মেয়ে উন্মুক্ত দরজার নিকট হইতে জিজ্ঞাসা করিল,—আপনি কে ?"

আ। আমাকে তুমি চিনবে না মা ;—তোমার নাম কি ?
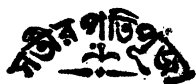
"আমার নাম বিরজা"—এই বলিয়া মেয়েটি তাহার বৈশাখী চাঁপার কলিকার মত দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলি কয়টী দিয়া অঞ্চলাগ্রে আবদ্ধ একটি চাবিকাটি হাতে তুলিয়া লইয়া তাহার গাত্র মার্জ্জনা করিল।

আমি বলিলাম,—"তোমাদের বাড়ীতে আমি একটি খবর জানিতে আসিয়াছি। বাবুরা কেহ বাড়ীতে আছেন?"

সে ফিরিয়া যাইতেছিল এমন সময় দরজার পাশের ঘর হইতে পুরুষকণ্ঠে ডাকিয়া বলিলেন,—"এইখানে আসুন।"

দরজার বাঁ দিকেই ঘর; এবং সেটা সদর প্রকোষ্ঠ। ঘরের মধ্যে ক্ষুদ্র একটু ফরাস। বাবু একখানি পাঁচ হাত বস্ত্রে দেহ বেষ্টন করিয়া ফরাসে বসিয়া চা পান করিতেছিলেন এবং ইংরেজী দৈনিক কাগজ পড়িতেছিলেন। আমি তথায় গমন করিলে, জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কি চান মশায়?"

আ। চাই না কিছুই, একটা কথা জানিতে আসিয়াছি।

বা। বলুন।

আ। আট মাস আগে যে নাপিতিনী আপনাদের বাড়ীর মেয়েদিগকে কামাইত, এখনও কি সেই কামায়?

বা। তিনি একটু কি চিন্তা করিলেন, তার পরে এক চুমুক গরম চা গলাধঃকরণ করিয়া বিরজার মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, —"যা'ত জেনে আয় ত।"

বিরজা বাড়ীর মধ্যে চলিয়া গেল এবং অচিরাৎ ফিরিয়া আসিয়া বলিল,—"না, সে আর আসে না।"

আমি বাবুকে তখন বিশেষ করিয়া বলিলাম,—"মহাশয় কোন একটি অনুসন্ধানে আমি লিপ্ত হইয়াছি। আপনি যদি একটু উঠিয়া মেয়েদের নিকট হইতে আমার জিজ্ঞাস্য এই কয়টি কথা জানিয়া আসিয়া বলেন, নিতান্ত অনুগৃহীত ও বাধিত হইব।"

বা। আপনার জিজ্ঞাস্য বিষয়ে যদি কেউ কিছু জানে, জানিয়া আসিয়া বলিতে পারি। কিন্তু সত্য কথা বলিতে কি, আপনাদের পুলিশ কর্ম্মচারীকে সাহায্য করিতে গিয়া অনেক ভদ্র-পরিবার অনেক সময় বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন; অনেক সম্ভ্রান্ত ঘরের মেয়েকে কোর্টে গিয়া সাক্ষী দিতে হইয়াছে।

আ। আমি পুলিশ কর্ম্মচারী নহি। আর বর্ত্তমান সংস্কারে সংস্কারাপন্ন শিক্ষিত পুলিশ কর্ম্মচারীগণও প্রায় সেরূপ কেহ করেন না। কারণ তাহা করিলে অনুসন্ধানের দ্বার ক্রমে ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়।

বাবুটি আর কোন কথা না বলিয়া নিঃশেষে চা টুকু পান করিয়া ফেলিলেন এবং উঠিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"কি জানিতে চান বলুন?"

আ। সেই নাপিতিনী কত দিন হইতে আসে নাই। সে কোথায় গেল, কিছু বলিয়া গিয়াছে কি না? তাহার বাড়ী
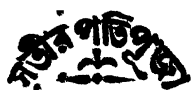
কোথায়? আর তাহার সম্বন্ধে যদি বিশেষ কেহ কিছু জানেন, জানিয়া বলিলে বড়ই বাধিত হইব!

বাবু চলিয়া গেলেন এবং অল্পক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,—"না মহাশয়, তার সম্বন্ধে আমাদের বাড়ীর কেহ বিশেষ কিছুই জানেন না। কত দিন হইতে অনুপস্থিত, তাহাও কাহারও স্মরণ নাই। তার বাড়ী শিবপুর,—চৌধুরী বাড়ীর কাছে।"

আমি সেই দিবস বৈকালেই শিবপুর গিয়াছিলাম। সন্ধানে সন্ধানে চৌধুরী বাবুদের বাড়ীর নিকটে এক নাপিতিনীর খোঁজ পাইলাম। প্রথমে সে কিছুই স্বীকার করিল না; আমি চৌধুরী বাবুদের বাড়ী গিয়া তাঁহাদিগকে ঘটনার কিয়দংশ কিছু অন্য প্রকারে, কিছু একটু মারাত্মক ভাবে বর্ণনা করিলে এবং তাঁহাদের সাহায্য পাইলে, আমি ঐ অনুসন্ধানকার্য্যে সাফল্য লাভ করিতে পারিব বলিলে, তাঁহারা আমাকে গোয়েন্দা পুলিশ কর্ম্মচারী মনে না করিয়া আমার সহায়তা করিলেন। তাঁহাদিগের সহায়তায় বিশেষ পীড়াপীড়ি করিয়া জানিতে পারা গেল, ঐ যুবক একটি বেশ্যা ও তাহার মাতাকে লইয়া গৌহাটীতে বাস করিতেছে। সেই বেশ্যার বাড়ী কলিকাতার জোড়াবাগান অঞ্চলে, এবং তাহার বাড়ীর রাস্তার নাম ও নম্বর সেই স্থান হইতেই জানিয়া লইতে পারিয়াছিলাম। আমি ঐ গুপ্ত জানিয়া কলিকাতায় চলিয়া

আসিলাম। নাপিতিনীর কথার সত্য মিথ্যা অনুসন্ধান করিয়া জানিতাম, সে মিথ্যা বলে নাই; বাস্তবিকই এক বেশ্যাকে লইয়া ঐ যুবক চলিয়া গিয়াছে। আমি আপনাদিগকে কিছু না বলিয়া সেই রাত্রেই গৌহাটীতে রওনা হই। এখানে আসিয়া দুই তিন দিন অনুসন্ধানের পর আপনার দাদার সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি এখন প্রায় রিক্তহস্ত, একখানি সামান্যাকারের মুদিখানার দোকান করিয়া অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছেন। তিনি এখন পর্য্যন্ত জানিতেন, ঐ যুবতী কুলাঙ্গনা; কারণ আমার পরিচয় ও আমার নিকট ঐ যুবতীকে বেশ্যা, এই সংবাদ গোপনে অবগত হইয়া তিনি প্রথমে চমকিয়া উঠেন এবং সম্পূর্ণরূপে আমার কথা মিথ্যা বলিয়া প্রতিবাদ করেন, কিন্তু আমি যখন দৃঢ় সত্যের উপর নির্ভর করিয়া আমূল ঘটনা তাঁহাকে বলিলাম, তখন তিনি যেন বিশ্বাস করিলেন, আর তাহাদিগকে ঐ কথা বলায় তাহারাও এখন স্বীকার করিয়াছে। তবে আপনার দাদা আর বাড়ী ফিরিবেন না, উহাঁদের সংস্রবেও মিশিবেন না; যেখানে ইচ্ছা স্বাধীনভাবে চলিয়া যাইবেন বলিতেছেন। আপনি পত্রপাঠ মাত্র চলিয়া আসিবেন এবং কিছু টাকা লইয়া আসিবেন, এখানে তাঁহার অনেকগুলি টাকা ঋণ হইয়াছে, পরিশোধ করিয়া দিয়া তাঁহাকে লইয়া বাড়ী যাইতে হইবে।

পত্রখানি শুনিয়া আমার স্বামী যে জীবিত আছেন; এ সংবাদ

জানিয়াও কে জানে কেন আমার তেমন আনন্দ হইল না। পতিহারা পত্নীর—স্বামিবিরহবিধুরা ভার্য্যার, স্বামী সমাগত হইবেন সংবাদ পাইলে যেমন আনন্দ হওয়া উচিত, আমার মনে তাঁহার কণামাত্রও আনন্দ হইল না। হৃদয়ভরা দুঃখের মেঘখানা আরও যেন জমাট পাকাইয়া বসিল। সেই দুঃখ-মেঘের এক-পার্শ্বে তিনি বাঁচিয়া আছেন, কোনরূপ বিপন্ন হন নাই এবং পুনরায় ফিরিয়া আসিবেন, এই সংবাদ-বিদ্যুৎ এই একবার চমকিয়া একটু আলোক দিয়াছিল মাত্র। তার পরে সেই গাঢ়—অতি প্রগাঢ় করাল দুঃখের মেঘ বর্ষণ আরম্ভ করিল—হায় আমি মরিলাম না কেন? যাহার স্বামী বেশ্যাসক্ত—বেশ্যা লইয়া দূর হইতে দূরান্তে গিয়া বাস করিতেছে, বেশ্যার অন্ন ভোজন—বেশ্যার সহিত রাত্রিদিবা বসবাস, বেশ্যার জন্য যাহার দৈনিক জীবনের সমস্ত সময় অতিবাহিত হয়, তাহার মহাপাপিনী স্ত্রীর, সে মহাপিশাচীর নরকেও যে স্থান হইবে না। যাহার বৃদ্ধ পিতা কম্পিতকরে কার্য্য করিয়া, যাহার পত্নী, মাতা ও পোষ্যবর্গকে পালন করিতেছেন, তিনি যাহার দেবতা, তাহার স্থান কোন্ নরকে? ভগবান্! তোমার বজ্র কাহার জন্য? আমার মত পিশাচীর মস্তকে তাহা নিক্ষেপ করিলেও বুঝি সে বজ্রাগ্নির অপমান করা হয়? আমার চক্ষু ফাটিয়া জল আসিল, আমি কোন উত্তর করিলাম না।

পত্রপাঠ পরিসমাপ্ত করিয়া পত্রখানি যথাস্থানে পুনঃ সংস্থাপন-পূর্ব্বক তিনি মায়ের নিকট গমন করিলে, আমি সেইখানে বসিয়াই আমার জীবনের ঘটনাবলী ও আরও কত ছাই ভস্ম ভাবিতে লাগিলাম।

চতুর্বিংশ উচ্ছ্বাস।

—•:*:•—

পরিণতি।

আমার দেবর তাড়াতাড়ি আহারাদিক্রিয়া পরিসমাপ্ত করিয়া যথাযোগ্য অর্থ ও দ্রব্যাদি লইয়া শিয়ালদহ ষ্টেসনে চলিয়া গেলেন এবং যথাসময়ে শিয়ালদহ হইতে রওনা হইয়া তৎপরদিবস অপরাহ্নে গৌহাটীতে গিয়া অনেক অনুসন্ধানে সেই বেশ্যাসুন্দরীর বাসায় উপস্থিত হইতে পারিয়াছিলেন।

ফিরিয়া আসিয়া আমার দেবর আমার নিকট তৎসম্বন্ধে যেরূপ যাহা বলিয়াছিলেন, আমি অবিকল এ স্থলে তাঁহারই উল্লেখ করিব। "ষ্টেসনের অনতিদূরে বিশালকায় ব্রহ্মপুত্রনদ, ঐ বিশালকায় জলবহুল ব্রহ্মপুত্র অস্তগমনোন্মুখ রক্তরবির প্রতিবিম্ব বুকে লইয়া আনন্দোৎফুল্লভাবে বায়ুসঞ্চালনে তরঙ্গভঙ্গীর সহিত গভীরগর্জ্জনে প্রকৃতিকে যেন মহাভীতি প্রদর্শন করিতেছিল। শুনিলাম অপর পারে যাইয়া অনুসন্ধান না করিলে তাঁহাদের সাক্ষাৎ পাইবার আশা নাই। কলিকাতাবাসী লোক হইলে সে সময় সে নদীর অপর পারে যাইতে নিশ্চয়ই ভয় পাইতেন, কিন্তু আমারা পূর্ব্ববঙ্গবাসী লোক,—আমাদের দেশ নদীবহুল,

কাজেই আমি ভীত হইলাম না, পার হইয়া পড়িলাম। এখন কোথায় গেলে দাদার বাসার সন্ধান পাইব। যিনি আমাদিগকে পত্র লিখিয়াছিলেন, তিনি সে সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই লেখেন নাই। যাহা হউক, অনেক কষ্টে সন্ধ্যার পরেই আমি সেই বেশ্যাসুন্দরীর বাসায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। তুমি হয় ত জিজ্ঞাসা করিবে, দাদার বাসা না বলিয়া বেশ্যাসুন্দরীর বাসা বলিতেছি কেন? বাস্তবিক তখন বাসা আমার দাদার নহে। সে ভীষণ দুঃখের কথা শুনিলে তুমি বড়ই কষ্ট পাইবে। কিন্তু যখন তোমার নামে দিব্য দিয়া আমাকে সত্য বলিবে বলিয়াছ এবং কোন কথা গোপন করিতে নিষেধ করিয়াছ, তখন যাহা সত্য সমস্তই বলিব। দাদা যে টাকাকড়ি লইয়া গিয়াছিলেন, সমস্তই তখন ফুরাইয়া গিয়াছিল। বেশ্যার কুহকে পড়িয়া কয়েক দিনের মধ্যে যখন তাঁহার সর্ব্বস্ব তাহাদের চরণে অর্পণ করিলেন, তখন তাহারা নিজমূর্ত্তি ধারণ করিল;—গাত্রাচ্ছাদিত মেষচর্ম্ম ফেলিয়া দিয়া বুভুক্ষু ব্যাঘ্রী নিজরূপে প্রকাশ পাইলে, গো-পালক যেমন ভীত হইয়া পড়ে, দাদাও তেমনই তাহাদের নিকট টাকাকড়ি সমস্ত রাখিয়া এখন তাহাদিগকে আসল কথা বলিতে শুনিয়া ভীত ও চমকিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

দাদা যে টাকাকড়ি এখান হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা প্রথমে সেখানে গিয়া নিজ তত্ত্বাবধানে রাখেন। কিন্তু অল্পদিন পরেই অবিশ্বাসের অভিমান ছল করিয়া বেশ্যাসুন্দরী সমস্তই আত্মসাৎ

করিয়া লয়; তৎপরেই দাদার নাপিতিনীমাসী কালিকাতায় ফিরিয়া আসে। বেশ্যাসুন্দরীও সামান্য খুটিনাটিতে দাদার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইতে আরম্ভ করে, এবং রোজগার না করিলে কি প্রকারে দিনপাত চলে, ইত্যাদি আপত্তি উত্থাপন করে। দাদা বলেন—আমি কখনও চাকুরী করি নাই বা জানি না; টাকা আনিয়াছি, ব্যবসায় করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিব। তুমি যে মূলধনগুলি চাপিয়া রাখিলে, কি দিয়া কি করিব? সে কিছুতেই টাকা দেয় না, ইহা লইয়াই বচসা। তার পরে এমন কি সে দাদাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজের ব্যবসায় চালাইতে আরম্ভ করে। দাদা তাহার কৃপা-ভিখারী অন্নদাস হইয়া ঘৃণ্যজীবের মত—আজ্ঞাবহ দাসের মত, অবস্থান করিতেন। সব কথা তোমাকে ভাঙ্গিয়া বলিতে লজ্জা করে; কি ভাবে বাস করিতেন, তাঁহার তখন কিরূপ অবস্থা,—তাহা কোন ভদ্রলোক, ভদ্রলোকের নিকটেই বলিতে পারে না, তুমি ত আমার মাতৃসদৃশী কুলাঙ্গনা।” আমি ঠাকুরপোর কথার ভাব অনেকটা বুঝিতে পারিয়াছিলাম, আর বলিতে নিষেধ করিলাম। যাহা হউক, কয়েকজন ভদ্রলোকের সাহায্যে আমার দেবর আমার পতিত স্বামীকে সেই নারকিনীর নরক-বাহু হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাড়ী লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন। বাড়ী আসিয়াও কিন্তু আমার স্বামী নিষ্কৃতি পান নাই। প্রকৃতির কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত হইতে আরম্ভ করিলেন। জ্বর প্রভৃতি কতকগুলি

ঘৃণ্যরোগ তাঁহাকে সবিশেষরূপে তিন চারি মাস ধরিয়া শাস্তিপ্রদান করিয়াছিল। আমিও কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিয়াছিলাম। একদিন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"আমি তোমার নিকট অনেক অপরাধে অপরাধী, কিন্তু তুমি প্রাণপণে আমার জন্য পরিশ্রম কর কেন? আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া আমার শুশ্রূষায় দিনাতিপাত কর কেন? সত্য কথা বলিও।"

সত্য কথা বলিতে কি, কায়মনোবাক্যে তাঁহার শুশ্রূষা করিতে আমার কোন কষ্ট হইত না। বরং আমার সমস্ত জীবনীশক্তি সে কার্য্যের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত, কিন্তু ঐ সকল কথা উঠিলেই তাঁহার উপর কেমন একটা ঘৃণা আসিয়া উপস্থিত হইত। আমার মনে হইত, যেন স্বামিমূর্ত্তি আমার বুকের ভিতর বসিয়া আছেন; আর ইনি কে? চক্ষু বুজিয়া ফেলিতাম, আমি মুখ নত করিয়া তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে বলিলাম,—"যাহা আমার কর্ত্তব্য তাহাই করিতেছি। ইহা আমার পতিপূজা, তাই করিতেছি।"

তিন চারিমাস পরে তিনি সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ করিলেন। আমরা সকলেই আশা করিয়াছিলাম, এইবার তিনি নিশ্চয়ই পাপপথ পরিত্যাগ করিবেন। কেন না, সকল কাজেরই ত একটা সীমা আছে। এরূপ ভাবে প্রতারণা, লাঞ্ছনা ও হৃত সম্পত্তি এবং আত্মীয় স্বজনের কাছে অবমানিত, তৎপরে ব্যাধির যন্ত্রণা, এ সকলেও কি তাঁহার চৈতন্য হইবে না? কিন্তু আরোগ্যের তিন
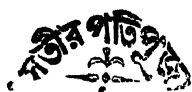
মাস পর হইতে আমাদের আশার বাসা ভাঙ্গিয়া গেল। আবার তাঁহাকে সেইরূপে পাপপথে বিচরণ করিতে দেখিয়া আমরা অবাক্ হইয়া গেলাম।

বলিতে কি, আমার স্বামীর অত্যাচার, অনাচার আগেকার অপেক্ষা এখন যেন আরও কিছু বাড়িয়া পড়িয়াছিল। যেন বিদেশ যাইয়া, সর্ব্বদা এই কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিয়া, সম্পূর্ণরূপে শিক্ষা করিয়া আসিয়া, বিজয়গর্ব্বে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ব্যবসায় কর্ম্মে কিয়ৎক্ষণ সংলিপ্ত থাকিয়া সন্ধ্যার পরই সেখান হইতে বহির্গত হইতেন এবং সমস্ত রাত্রি প্রায় ঐ কার্য্যে অতিবাহিত করিয়া, কোন দিন রাত্রেই গৃহে ফিরিতেন, কোন দিন ফিরিতেন না। আমরা তাঁহাকে কত বুঝাইতাম, যাহার সহিত যেমন সম্পর্ক তিনি তেমনই ভাবে উপরোধ, অনুরোধ করিতেন। আমি তাঁহার পায়ে ধরিয়া কত কাঁদিতাম, কত সাধিতাম, কত মিনতি করিতাম; কিন্তু তিনি সে সমুদয় উপেক্ষা করিয়া অসৎপথে বিচরণ করিতেন।

এইরূপ অত্যাচার, অনাচার, এইরূপ দুঃখকষ্টের মহাদংশনে আমাদের আরও এক বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীভগবানের ইচ্ছায় তাঁহার এত অত্যাচার সত্ত্বেও আমাদের ব্যবসায় কাজের খুব উন্নতি হইয়াছিল। চাউলে প্রায় লক্ষ টাকা ও তাহার পর পর সর্ব্ববিষয়েই প্রচুরতর আয় হইয়া আসিতেছিল।

এই সময় আমার আর একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে। কন্যাটি

হইবার সময় হইতে আমি অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়ি, এবং যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে আমার একেবারেই উত্থানশক্তি ছিল না, এমন কি নিজে স্বাধীন ভাবে পার্শ্বপরিবর্ত্তনের ক্ষমতাও ছিল না।

তাঁহার এই সকল ব্যবহারে এক একদিন মনে বড়ই কষ্ট পাইতাম, এবং সমস্ত রাত্রি কিছুতেই ঘুমাইতে পারিতাম না।

আমি যেখানে শয়ন করিতাম, তাহার পার্শে জালানা, বিশুদ্ধ বায়ুসমাগমের জন্য জালানা প্রায়ই উন্মুক্ত থাকিত।

রাত্রি গভীর—সর্ব্বত্র নিস্তব্ধ। আমি জানালা-পথে বাহিরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চিন্তা করিতেছিলাম। সহসা আকাশপ্রান্তে সৌদামিনী চমকিল, মেঘবজ্র হাসিয়া উঠিল, উন্মাদের ন্যায় বায়ুরাশি দিক্ হইতে দিগন্তে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। আর সেই বায়ু-বজ্র-বিদ্যুৎকে সমাচ্ছন্ন করিয়া প্রবলবেগে বারিধারা পড়িয়া কলিকাতার রাস্তা ডুবাইয়া তুলিল। অনেকক্ষণ ধরিয়া এইরূপ দৈব দুর্য্যোগ চলিতে লাগিল।

সেই ঝড়-জল দেখিয়া হঠাৎ আমার মনে আর এক নূতন দুশ্চিন্তার উদয় এই হইল যে,—তিনি ত এখন বাহিরে নাই! যদি থাকেন, তবে হয়ত ভিজিয়া কত কষ্ট পাইতেছেন! আবার মনে হইল, না না, তাহা হইতে পারে না। ঝড়-জল আসিবার পূর্ব্বেই তিনি আড়ং-বাড়ীর গৃহে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতেছে। নয়ত তাঁহার মনের মত কোন স্থানে অবস্থান করিতেছেন।
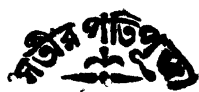
কিন্তু আমার আশঙ্কাই ঠিক। ইহার কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি ভিজিতে ভিজিতে বাড়ী আসিলেন। তাঁহার নগ্নপদ, হস্তে আর্দ্র জুতা! গায়ের জামা ও পরিধানের কাপড় এবং সর্ব্বাঙ্গ বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছে। সে মূর্ত্তিদর্শনে বড়ই কষ্ট হইল। আমি কোন কথা কহিলাম না, উঠিবার শক্তি নাই যে উপযুক্ত বস্ত্রাদি তাঁহাকে প্রদান করিব। তিনি নিজেই বস্ত্রাদি লইয়া তাহা পরিধান করিলেন, এবং কোন সৎকর্ম্ম সমাধা করিয়া আসিয়া মানুষ যেমন স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহার আত্মীয় স্বজনের নিকট উপবিষ্ট হয়, তিনিও তেমনই ভাবে আমার নিকট আসিয়া উপবিষ্ট হইলেন। এই সময় খুকী জাগিয়া ক্ষুধার্ত্ত করুণকণ্ঠে কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

খুকীর তখনকার ভাব এবং ক্ষুধার্ত্ত খুকীর করুণ কান্না, নিজের রোগক্লিষ্ট দেহের উত্থানশক্তিরাহিত্য—সকলগুলি একত্রে জোট পাকাইয়া আমার হৃদয়কে বড়ই ক্ষুণ্ণ করিয়া তুলিতে লাগিল এবং চক্ষুর জল টানিয়া বাহির করিয়া দিয়া উপাধান ভিজাইয়া তুলিতে লাগিল। খুকীর কান্না ক্রমেই বর্দ্ধিত হইয়া উঠিতেছিল, তৎশ্রবণে আমি কতকটা আত্মসংযম করিলাম অধিক রাত্রি জাগরণান্তে কিয়ৎ ক্ষণ পূর্ব্বে দিদিমা ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন, কিন্তু তাহাকেই ডাকিলাম, তিনি একে বৃদ্ধা তদুপরি রাত্রি জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলেন। কাজেই আমার সেই ক্ষীণ কণ্ঠের স্বর তাঁহাকে জাগাইতে সক্ষম হইল না। খুকী মানুষের গলার সাড়া পাইয়া

আরও কাঁদিয়া গড়াগড়ি দিতে লাগিল। তৎদর্শনে আমার প্রবহমান চক্ষুর জল আরও বেগধারণ করিল, দুঃখে বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। ভগবানের উপর বড়ই রাগ হইল। আর্তস্বরে বলিলাম,—হা ভগবান্, যাহার সব থাকিতে কেহ নাই, যাহার স্বামী পরদার-নিরত, যে রোগে উঠিতে পারিবে না, নড়িতে পারিবে না, তাহাকে সন্তান দেওয়া কেন, ইহাও কি আমাকে শাস্তি দেওয়ার জন্য?

খুকীকে বলিলাম,—হতভাগিনী! জন্মিবার আর কি জায়গা পাও নাই; পিতা যার নরকসুখে নিমগ্ন, মাতা যার রোগে ক্রোড়ে লইবার শক্তি হইতে বঞ্চিত, যাহার শুষ্ককণ্ঠে একবিন্দু দুধ দিবার কেহ নাই, তাহার জন্ম কেবল যাতনার জন্য নয় কি? হায়! তোমার গলা শুকাইয়া যাইতেছে, ক্ষুধার জ্বালা ধরিয়াছে, একপাশে শুইয়া পিঠে হয়ত বেদনা ধরিয়া গিয়াছে, আর আমি হতভাগিনী তাহাই চোখে দেখিতেছি—তাহাই কানে শুনিতেছি। উঠিবার শক্তি নাই, হা ভগবান্! ইহা শুনিয়া স্বামী আস্তে আস্তে উঠিলেন এবং খুকীকে কোলে করিলেন ও আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "দুধ কোথায়? আমি খাওয়াইয়া দিতেছি।"

আমার বড় রাগ হইল। বলিলাম,—"সে কি! তুমি এত কষ্ট করিতে যাইবে কেন!" তিনি কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ, কিঞ্চিৎ পরুষ স্বরে বলিলেন, "তুমি বল কি?"

আমি। বলি আমার মাথা আর মুণ্ড, রাত্রি কত?

তিনি। তিনটা হইতে পারে—কেন ?
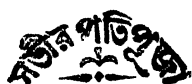
আমি। এত রাত্রে কোথা হইতে ভিজিতে ভিজিতে আসা হইল ?

তিনি। যেখানে কাজ ছিল।

আমি। একটা কথা বলিব—রাগ করিবে না ত' ?

তিনি। কথা না শুনিলে, রাগ করিব কি না, কেমন করিয়া বলিব ?

আমি। দেখ,—আমি তোমার স্ত্রী। স্বামী ব্যতীত স্ত্রীর আশ্রয়স্থান আর নাই;—আমি মরিতে বসিয়াছি, চিকিৎসকেরা অস্ত্রচিকিৎসা করিয়া কেবলমাত্র দুগ্ধ পথ্য দিয়াছেন, নড়িতে চড়িতে নিষেধ করিয়াছেন। বাঁচিব কিনা, এখনও তাঁহারা স্থির করিয়া বলিতে পারেন নাই। পার্শ্বপরিবর্ত্তন পর্য্যন্ত ক্ষমতা রহিত। তুমি কিন্তু তাহাতে ভ্রূক্ষেপও কর না। তোমার বৃদ্ধ পিতামাতা আমাকে লইয়া ও সদ্যোজাত শিশুকে লইয়া এই দীর্ঘকালের খাটুনিতে মারা যাইতে বসিয়াছেন, আর ঐ ক্ষুদ্র শিশু—রক্তের দলা, মাতৃক্রোড়-চ্যুত, স্তন্যপানবিরহিত, তুমি উহার দিকে একবার ফিরিয়াও চাহ না। তার পরে তোমার নিজের শরীর—জান তুমি কি কাল কাশ রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলে ? যদিও শ্রীভগবানের কৃপায় এই কয় মাস তাহা হইতে মুক্ত হইয়াছ, তুমি কি জান না ঐ সকল রোগের ভয় করিয়া চলিতে হয়। কিন্তু তুমি এ সকল কিছুই

মান না, —কিছুই কর না। ভালবাসা, ভক্তি স্নেহ ও জীবনের প্রতি তাচ্ছিল্য করিয়া কাহার অনুসন্ধানে—কোন্ সুখের অন্বেষণে সমস্ত রাত্রি ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াও, মানুষ দূরের কথা, পশুও তাহার শিশু সন্তানটীকে রক্ষা করিবার জন্ত ব্যগ্র থাকে, তুমি আমাদিগকে ভুলিয়া গিয়াছ, আশ্চর্য্য হই নাই, কিন্তু তোমার সন্তান দুইটিকে ভুলিলে কি প্রকারে?

আমার কথায় তিনি অনেকক্ষণ দুম ধরিয়া রহিলেন। তার-পর কিছু রুক্ষ, কিছু উগ্রস্বরে বলিলেন,—"আমি কাজে ঘুরিয়া থাকি। তোমার রোগ হইয়া কত টাকা ব্যয় হইতেছে, খবর রাখ। এ সকল টাকা আসে কোথা হইতে?" আমার বড় দুঃখে হাসি আসিল; বলিলাম—"রাত্রে কলিকাতার লোক যখন ঘুমাইয়া পড়ে, তখনই তুমি অর্থ সংগ্রহের জন্ত দুয়ারে দুয়ারে ঘুরিয়া থাক! জানি না কলিকাতার কোন ভালমানুষ তোমার অর্থের অভাব নিবারণের জন্ত রাত্রি তিনটা পর্য্যন্ত জাগিয়া বসিয়া থাকে।"

তিনি সে কথার কোন উত্তর দিলেন না, আমিও নীরব হইলাম।

আমি নীরব হইলাম, কিন্তু আমার হৃদয়ের মধ্যে শত বৃশ্চিকের দংশনযন্ত্রণা অনুভূত হইতে লাগিল। মৃত্যুর অধীন না হইলে এ যাতনার শেষ হইবে না, ইহাই আমার শেষ সিদ্ধান্ত।

পঞ্চবিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

সম্ভাষণ।

মানবীয় সুখ-দুঃখের প্রতি কাল ভ্রূক্ষেপ করিয়াও চাহিয়া দেখে না;—সে যেমন অবিরত গতিতে—বাধা বিঘ্ন বিহীন স্রোতে আবহমান চলিতেছে,—তেমনই চলিতেছে, তেমনই চলিবে। আমাদের গণনার হিসাবে প্রাগুক্ত ঘটনার পরে, আরও চারি বৎসর কাটিয়া গেল, এই কয় বৎসরের মধ্যে সুখ দুঃখ অবশ্য সমস্তই ঘটিয়াছিল। ইহার মধ্যে আমরা কখন দেশে কখন কলিকাতায় এইরূপে কাটাইয়াছিলাম।

তারপরে আমরা কলিকাতায় গিয়া বাস করিতেছিলাম। পুত্র কন্যা দাসদাসী প্রভৃতি এবং ব্যবসায়ের আর্থিক উন্নতি ও অলঙ্কারাদির বাহ্যাড়ম্বরে লোকে আমাকে মহাসুখী বলিয়াই জ্ঞান করিত। হয়ত কয়জন আমার মত অবস্থা প্রাপ্ত হইবার জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিত। কিন্তু হায়! সুখ কোথায়,—আনন্দ কোথায়! জ্ঞানিগণের লিখিত গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি,—ত্যাগে সুখ, ভোগে দুঃখ। কিন্তু এ স্থলে ত্যাগ করিব কি? যাহা ত্যাগ করা রমণীর সাধ্যাতীত—যাহা ত্যাগ

করিলে রমণীর পৃথক্ সত্তা নাই—বুঝি ধর্ম্ম কর্ম্ম কিছুই নাই; সেই নররূপে নারায়ণ পতিরূপে ঈশ্বর, পালকরূপে মোক্ষদাতা, স্বামী আমার চরিত্রহীন। তিনি সংসার করেন, সন্তান পালন করেন, ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নতিকর কার্য্য করেন এবং আমার সহিতও নিতান্ত অসৎ ব্যবহার করেন না, কিন্তু তিনি শয়তান—তিনি চরিত্রহীন। সুরা ও বারাঙ্গনাবিলাসেই তাঁহার জীবনের মর্ম্মগ্রন্থিটী যেন জড়াইয়া গিয়াছে। আমি কত অনুরোধ করিয়া দেখিয়াছি, কত জ্ঞানীর লিখিত পুস্তক পাঠ করিয়া শুনাইয়াছি, কত গ্রন্থ-লিখিত, কৃতচিহ্নিত শাস্ত্রের মহৎ বাক্য সম্মুখে ধরিয়াছি,—কত অনুনয় বিনয় করিয়াছি, পায়ের তলায় মাথা কুটিয়াছি, আত্মহত্যা করিতে গিয়াছি, রাগ করিয়া নিকটে বসিয়া বিনিদ্র রজনী কাটা-ইয়া দিয়াছি, কিন্তু তাঁহার অভ্যাস গেল না,—কিছুতেই শোধ-রাইতে পারিলেন না। ইহাতে আমি অপর সর্ব্ববিধ সুখের মধ্যে দুঃখের ভীষণ অগ্নিতাপ লইয়া সংসারে বিচরণ করিতাম। যখন দেখিতাম সন্ধ্যার ধূসর রাগ রঞ্জিত রাজপথ বাহিয়া ভিখারী দম্পতি সমস্ত দিনের পর্য্যটনজনিত শ্রান্ত-ক্লান্ত দেহে ভিক্ষালব্ধ সামান্ত তণ্ডুল লইয়া তাহাদের পর্ণকুটীরে ফিরিতেছে, তখন ভাবিতাম আমার চেয়ে ইহারা সুখী; কেন না একপ্রাণে, একধর্ম্মে, এক উদ্দেশ্যে উহারা কন্টককণ্টকিত বন্ধুর সংসারে বিচরণ করিতেছে।

ইহার পরে আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল—হায়! কে

জানিত স্বামীর মহাপাতক ইহকালের স্ত্রীতেও সংক্রামিত হয়। আমিও তাঁহার মহাপাতকের অংশী হইয়া ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িলাম এবং সেই ব্যাধি আমাকে একেবারে শয্যাশায়িনী করিয়া ফেলিল। স্বামীও তাহাতে যথেষ্ট অর্থব্যয় করিয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন এবং শুশ্রূষা ও পথ্যের কোনরূপ ত্রুটী না হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার কিছুই ভাল লাগিত না। আমার বোধ হইত—বিশ্বাস হইত স্বামী নরকে, তবে ত নিশ্চয়ই আমার নরকনিবাস হইবে। আমি কি তবে কায়মনো-বাক্যে স্বামী ও শ্যামসুন্দরকে আজীবন বৃথা চিন্তা করিয়া আসিলাম? আমি কি তবে কালীমাতাকে বৃথা ভক্তিপুষ্পে পূজা করিলাম? আমি কি তবে শুধু সমস্ত দেবতাগণকে বৃথা ডাকিয়া জীবন কাটাইলাম? এ সকল কি পুণ্যকর্ম্ম নহে? পুণ্যের কি পুরস্কার নাই? কর্ম্ম কি ফলদানে অক্ষম?

এক দিবস দ্বিপ্রহরের সময়ে নীরবে নিস্তব্ধগৃহে মেঝের উপর পড়িয়া, এইরূপ ভাবনা ভাবিতেছিলাম, এমন সময়ে আমার স্বামী গৃহে আসিয়া পার্শ্বপতিত একখানি আরামচৌকিতে উপবেশন করিলেন। তাঁহার পা দুইখানি লম্বিত হইয়া আমারই বক্ষেরই কাছে আসিয়াছিল। আমার তখনও শরীর ভাল করিয়া সারে নাই, অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। কিন্তু মানসিক উত্তেজনায় ধাঁ করিয়া উঠিয়া বসিলাম এবং দুইহস্তে তাঁহার চরণ দুইখানি

চাপিয়া ধরিয়া তাঁহার মুখের দিকে করুণার্দ্র নয়নের উর্দ্ধোন্নত দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিলাম,—"আমার নিকট সত্য গোপন করিও না? ইহার পূর্ব্বে যখনই এ সকল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছি, তখনই মিথ্যা বলিয়া চাপিয়া গিয়াছ, আজ আর মিথ্যা বলিও না।"

আমি উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া অনেকক্ষণ সেইরূপ ভাবেই তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনিও অনেকক্ষণ কোন কথা কহিলেন না। সমস্ত গৃহখানা নীরব—নিস্তব্ধ, কেবল গৃহ-কোণস্থ ক্ষুদ্র টেবিলের উপর পড়িয়া, বি-টাইমপিস ঘড়িটি সমতালে টিক্ টিক্ করিয়া তাহার আত্মজীবনের দুঃখকাহিনী যেমন প্রকৃতির দরবারে নিষ্ফলাবৃত্তি করিয়া থাকে, তেমনই করিতে লাগিল।

আরও অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, তথাপি তিনি কোন কথা কহিলেন না। কিন্তু তাঁহার মুখ চোখ সব লাল হইয়া ঘামিয়া উঠিতেছিল।

আরও কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়াও যখন তাঁহার কোন উত্তর পাইলাম না, তখন পুনরপি বলিলাম, কই উত্তর দিলেন না। তিনি মর্ম্মস্থল হইতে নিশ্বাস টানিয়া লইয়া বাহিরে ফেলিলেন, তারপরে একটু নড়িয়া চড়িয়া কষ্টোচ্চারিত কণ্ঠে ভগ্নস্বরে কহিলেন,—কি বলিব?

আমি। যাহা জিজ্ঞাসা করিলাম।

তিনি। কি জিজ্ঞাসা করিয়াছ, আমার স্মরণ নাই।

আমি। আমার নিকট সত্য গোপন করিবে না?

তিনি। না।

আমি। তুমি কি এ পাপ-পথ পরিত্যাগ করিতে পারিবে না?

তিনি। যদি বলি—না?

আমি। যদি তাহাই সত্য হয়—যদি পাপপথে বিচরণ করিয়াই সুখে থাকা বিবেচনা কর, যদি পরকাল না মান,—নরক-নিবাসের অনন্ত যাতনা স্মরণ করিতে না পার, তবে উহাই কর। আমি কতদিন তোমাকে ঐ পাপ-পথ হইতে ফিরিবার জন্য উপরোধ অনুরোধ করিয়াছি, মহতের বাক্য শুনাইয়াছি, পরকালের কথা বুঝাইয়াছি, কিন্তু হায়! তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই। দেখ, তুমি স্বামী—আমি স্ত্রী, তুমি গুরু—আমি শিষ্যা,—তুমি আমাকে শিখাইবে আমি শিখিব।

তিনি। থাক্ সে কথা, আমার জন্য তোমার এত ভাবনা কেন? আমি তোমাকে অযত্ন করি না, তোমার সুখের কোন প্রকার বিঘ্ন উৎপাদিত হয়, এমন কার্য্য করি না। ঘর দুয়ার, দাস দাসী, বস্ত্র অলঙ্কার প্রভৃতি যাহা রমণীগণের প্রার্থনীয় তাহা সমুদয় দিতেছি। ভালবাসার ত্রুটি করি না, তবে এত কেন?

আমি। তুমি যদি হীনচরিত্র না হইয়া সাধু-প্রকৃতিতে দিনান্তে এক মুটা আনিতে, তাহাই খাইয়া সুখী হইতে পারিতাম। মূল্যবান্ বস্ত্রালঙ্কারের পরিবর্ত্তে শাঁখা ও শাড়ী পরিতে দিতে, তাহাতেও পরিতৃপ্ত হইতাম। আর ভালবাসার কথা বলিলে, আমাকে ভালবাস এ ছলনা কেন?

তিনি। না, না, মিছা কথা বলি নাই, সত্যই ভালবাসি।

আমি। দেখ, আমি খুকী মেয়ে নই; ভালবাসা কাহাকে বলে তাহা মনে প্রাণে অনুভব করিতে পারি। যেমন ধ্যান-ধারণা এক ইষ্টদেবতা ব্যতীত বহু দেবতায় সম্ভবে না, তেমনই ভালবাসাও বহু যায়গায় হয় না। আমাকে যদি তুমি ভালবাসি বল, তবে আবার অন্যদিকে ছুটাছুটি করিয়া ফের কেন? যদি বল আমার মনের মত রূপ ও গুণ তোমাতে নাই; সেই রূপ বা গুণের অন্বেষণে অপর স্থানে ঘুরাঘুরি করিয়া থাকি। রূপ ও গুণ মানুষে নাই, আছে প্রেমে; যদি ভালবাসিতে, এই রূপই তোমার মনের মত হইত।

আমার স্বামী নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার উত্তরের প্রতীক্ষা করিয়া যখন কোন উত্তর পাইলাম না, তখন পুনরপি আমিই বলিলাম,—"তুমি ভালবাস আর নাই বাস, আমার তাহাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই। আমি ভালবাসিয়াই সুখী হইতে পারিতাম, কিন্তু সে সুখেও তুমি বঞ্চিত

করিয়া দিয়াছ।” হঠাৎ ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে মানুষ যেমন চমকিয়া চাহে, আমার স্বামীও তেমনই ভাবে আমার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,—“কেন?”

আমি। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী; স্বামী যে পাপ বা পুণ্য করে স্ত্রীকে তাহা ভোগ করিতে হয় এবং স্ত্রী যে পাপ বা পুণ্য করে তাহাও উভয়কে ভোগ করিতে হয়। তুমি যে সকল মহাপাতক করিয়াছ, নিশ্চয়ই তাহার ভোগ আমাকে করিতে হইবে। বলা বাহুল্য, ইহাতে তোমার প্রতি আমার ভক্তির কথঞ্চিৎ হ্রাস হইলেও আমার আবার মহাপাতকের সৃষ্টি হইল। এইরূপে আমরা উভয়েই পাপপুরুষের উত্তপ্ত লৌহ-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া জন্মে জন্মে—অবনতি লাভ করিতে থাকিব।

তিনি। তোমার নিকট বলিতেছি, আমি আর পাপ করিব না।

আমি। বিশ্বাস হয় না। বড় আসক্তির দাস। মানুষেরও শ্মশানে গেলে—একটা শ্মশান-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। কিন্তু আবার ঘরে আসিলে, যে আসক্তির দাস,—সেই আসক্তির দাস। তুমি এখন বলিয়া যাইতেছ,—আর ঐ সকল পাপ করিবে না, কিন্তু সেই কুহকিনীগণের কুহকজাল-পার্শ্বে গমন করিলে, কোন জ্ঞান থাকিবে না,—জাল ঠেলিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে।

মহাপাতকের পথ বড় পিচ্ছিল, একটু অগ্রসর হইলে হটিয়া আসা বড় কষ্টকর।

আমার স্বামী কোন কথা কহিলেন না,—নীরবে বসিয়া রহিলেন। উভয়েই নীরবে নিস্তব্ধ ভাবে রহিলাম, তারপরে তিনি উঠিয়া চলিয়া গেলেন।

ষড়বিংশ উচ্ছ্বাস।

—•:•:•—

অর্ঘ্যদান।

ইহার পর আরও কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। অপর-যে দিক দিয়াই দেখা যায়, শ্রীভগবানের করুণা-কণা পাইয়া আমি যেন সর্ব্বপ্রকারেই সুখী হইয়াছিলাম। আমার স্বামী ব্যবসা বাণিজ্যে বেশ উন্নতি লাভ ও যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। শ্বশুর শাশুড়ী তখন বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাঁহারা ইচ্ছামত কখন দেশে থাকিতেন, কখনও কলিকাতায় থাকিতেন, কখনও বা শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থ ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। আমার ছেলে মেয়েগুলি ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া উঠিতেছিল; কেহ আমার নিকট থাকিত, কেহ বা আমার বাপের বাড়ী আমার মাতার নিকট থাকিত, কখন কেহ বা আমার শাশুড়ীর নিকটে থাকিত। ফল কথা, অর্থকৃচ্ছ্রতা ছিল না। তাহাদের ইচ্ছা ও স্বচ্ছন্দমতে যখন যেখানে আদরে, সোহাগে বিচরণ করিয়া ফিরিত। আমার স্বামীর রোগও তখন আরোগ্য হইয়া গিয়াছিল, তিনি মেঘমুক্ত চন্দ্রমার ন্যায় প্রশান্তভাবেই কার্য্যক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছিলেন। আমারও তখন শারীরিক ব্যাধি ছিল না, স্বচ্ছন্দ শরীরে কাল কাটাইতেছিলাম।

এত সত্ত্বেও কিন্তু আমার মনে আনন্দ বা সুখ ছিল না। বৃক্ষের কোটরস্থ অগ্নি অন্যের চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া যেমন বৃক্ষের অন্তঃসার দগ্ধ করিতে থাকে, আমার হৃদয়েও তেমনই সেই এক চিন্তা-বহ্নি নিরন্তর জাগরূক থাকিয়া আমাকে দগ্ধ করিত।

মনে হইত কি করিলাম, দুর্লভ মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া, ধর্ম্ম সাধন করা হইল না। মানুষ পশুতে বিভিন্ন এই জন্য যে, পশুরা ধর্ম্ম সাধন করে না, মানুষ তাহা করিয়া থাকে। নতুবা আহার, নিদ্রা, ভয় ও বংশবৃদ্ধি এ সকল পশুতেও করে, মানুষেও করে! তবে মানুষ ও পশুতে প্রভেদ রহিল কি? তোমরা বলিতে পার,—তোমারি অর্থ আছে, ধর্ম্ম করিবার ভাবনা কি? ব্রত নিয়ম কর, পূজা অর্চ্চনা কর, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান কর, কাঙ্গালী-ভোজন করাও,—ধর্ম্ম হইবে। ইহাই মানুষের ধর্ম্ম-কার্য্য

স্বীকার করি, এ সকল ধর্ম্ম-কার্য্য; কিন্তু নারীজাতির পক্ষে এ সকল গৌণ ধর্ম্ম। স্বামী যাহা করেন, স্বামী যে ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাহার সহিত সেই ধর্ম্মের আচরণ নারীর মুখ্য ধর্ম্ম।

স্বামী স্ত্রীতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম প্রতিপালন করিবে, পোষ্যবর্গের প্রতিপালন করিবে—উভয়ে অনন্যমনা হইয়া শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন, অর্চ্চনা ও লীলাগুণানুবাদ করিবে, তারপরে অন্যান্য দেব দেবীর পূজা বন্দনা দর্শন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবকে দান, অতিথি-পালন ও কাঙ্গালী ভোজন প্রভৃতি করিবে।
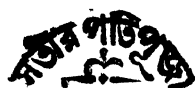
স্বামী বা স্ত্রী একটীর অধঃপতন হইলে অপরটীর অধঃপতন সুনিশ্চিত। আমার স্বামী যখন পাপপঙ্কে লিপ্ত, তখন আমার আবার ধর্ম্ম কি আছে? আমি সারাজীবন শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেও তাঁহার পাপ-রাক্ষসীগণ সে যজ্ঞের ঘৃত খাইয়া ফেলিয়া যজ্ঞ ভঙ্গ করিয়া দিবে।

স্বামীর করুণা, স্বামীর অন্য অভিলাষশূন্য ভালবাসা রমণীকে শত পাতক হইতে মুক্ত করিয়া আনন্দ-মন্দাকিনীর পূত-সলিলে স্নান করাইয়া লয়। তারপরে স্বামীর নিষ্পাপহৃদয়ের সংযম-শক্তি লাভ করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বামিময় হইয়া পড়ে—তখন দ্বৈত-বাদের কঠোর জ্বালা যাইয়া অদ্বৈতবাদের সুধাধারা খেলিতে থাকে। এই জন্যই প্রেমের এত মহত্ত্বকাহিনী সর্ব্বদেশের সর্ব্ব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে।

কিন্তু হায়! আমার স্বামীর মত—অনেক হতভাগিনীর স্বামী তাহা না বুঝিয়া বৃথা প্রেমের আশায় মুগ্ধ হইয়া বিপথে বিচরণ করেন। পিপাসার্ত্ত হইয়া গৃহস্থিত পবিত্রাধারপরিপূরিত গঙ্গা জল পরিত্যাগ করিয়া পঙ্কিল—পূতিগন্ধ পরিপূর্ণ ডোবার জল পান করিতে ধাবমান হন। এক স্থানে সে পঙ্কিল পূতিগন্ধময় তপ্ত বারিপানে পিপাসা মিটাইতে না পারিয়া, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে, আবার সে স্থান হইতে অপর স্থানে ঘুরিয়া মরেন,—কিন্তু পিপাসা যায় না। অধিকন্তু নানা স্থানের বিষ-

বারিপানে কঠিন কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হন। আমাদের দেশের এক নমস্য বৃদ্ধ কবি বহুদিন হইল গাহিয়া গিয়াছেন,—

পবিত্র প্রণয় মাঝে, সুখনিধি যদি চাহ,
একজনে মন সঁপে তাহারই হইয়া রহ।
একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয় ভজে,
পবিত্র সুখ-সরোজে বিরাজে যে অহরহঃ।
নতুবা যে অনুরাগে অংশ করে ভাগে ভাগে,
বিরাগ তার ঘটে সোহাগে যাতনা সহে দুঃসহ॥

সতীর স্বামী মতিহীন হইয়া অধিকাংশ স্থলে বিপদগামী কেন হন, সে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি। অন্যবিধ কারণে চরিত্রহীন হন, অল্প লোক। অধিকাংশ পিশাচী বারাঙ্গনাগণের বিস্তৃত জালে জড়িত হইয়া এইরূপে মজিয়া সতী স্ত্রীর সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণ হইয়া থাকেন এবং তাঁহাদের দাম্পত্য জীবনে ঘন কালিমা ঢালিয়া দেন।

কিন্তু এদিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। নগরমধ্য হইতে—সমাজের বক্ষঃস্থল হইতে এই সকল পিশাচীগণকে বিদূরিত করাই সমাজের নেতাগণের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য। নিত্য ইহাদিগের বিলাস-বহ্নিতে যে কত যুবক দগ্ধ হইতেছে, কত সোণার সংসার ছারে খারে যাইতেছে, কত অর্থ ব্যয়িত হইতেছে, কে তাহার ইয়ত্তা করিতে পারে। সুবাস সুগন্ধে কুসুম প্রস্ফুটিত হয় দেবতার পূজার

জন্ম ; ফুল দেবতার অংশবিশেষ বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। সেই ফুল তোড়া, মালা প্রভৃতি বহুবিধ আকারে এই নারকীগণের—এই কুলভ্রষ্টা কলঙ্কিনীগণের—এই পিশাচীগণের পৈশাচিক লীলার জন্ম চরিতও ব্যয়িত হইতেছে।

সৎশিক্ষা ও সৎ উপদেশ দানের অভাবে অনেক যুবক এই সর্ব্বনাশকর পাপপথে গমন করিয়া থাকে, আবার অনেকে কুল কুমারীর সঙ্গে মিশিয়া তাহাদের পাপ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া এই কুপথের পথিক হয়। সমাজের কর্ত্তব্য—পিতা মাতার কর্ত্তব্য—অভিভাবকগণের কর্ত্তব্য—যাহাতে যুবকগণ—বংশধরগণ এই কাল-নাগিনীগণের বিষদন্তে আহত না হয়।- তাহার জন্ম চেষ্টা ও উপদেশ দান করা। নতুবা আমার মত শত শত হতভাগিনীর নিত্য চক্ষুর ঝরা জলে বঙ্গভূমির বক্ষ আর্দ্র হইয়া যাইবে। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম-ভূমি বঙ্গদেশ হইতে ধর্ম্মকর্ম্ম বিলুপ্ত হইবে।

আমি সর্ব্বপ্রকার সুখের মধ্যে থাকিয়াও যখন অশান্তির আগুনে দগ্ধ হইতেছি, তখন আমার ন্যায় যাহাদের পতি বিপথগামী এই-রূপ অর্থহীনা কত হতভাগিনী যে যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা কে রাখে? হয়ত কাহারও পতির মাসিক সমস্ত আয় বেশ্যার পদে উড়িয়া যাইতেছে, আর সে হতভাগিনী এই তিনটী শিশু লইয়া কোন এক ক্ষুদ্র ভাড়াটিয়া কক্ষে পড়িয়া অন্না-ভাবে হাহাকার করিতেছে।

যাহা হউক, সে সকল ভাবনা ভাবিয়া ক্ষুদ্র রমণী আমি—কি করিতে পারিব। আমার যাহা লইয়া অন্তর্দাহ, যাহা লইয়া সুখের বাসরেও মরণযাত্রা তাহা তোমাদিগকে শুনাইলাম।

যখন আমি উন্মুক্ত জানালার ধারে বসিয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলাম,—নিজের দুঃখ—সমাজের মহাপাতক—সমাজের অধঃপতন ও জনসঙ্ঘের ধর্ম্ম ও নীতি বিষয়ের ঔদাসীন্য চিন্তা করিয়া অন্তর্দাহে দগ্ধ হইতেছিলাম, তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিতেছিল। মৌন মুগ্ধ সন্ধ্যার আবিলতা ভঙ্গ করিয়া আমাদের সেই প্রাসাদতলস্থ রাস্তার উপর দিয়া একটী সুকণ্ঠ গায়ক আপন মনে গাহিতে গাহিতে মৃদু গমনে চলিয়া যাইতেছিল। তাহার গতি অতি মন্থর হওয়াতে গানটীর আদ্যোপান্ত শুনিতে পাইয়াছিলাম। তাহাতে আমার কতকটা মোহ ভাঙ্গিয়া গেল। বুঝিলাম, এ মহানগরীতে কেবলই পাপের লীলা-কাহিনী গীত হয় না, যাহা লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব—সেই ধর্ম্মকাহিনীতেও মৃত্যু-সঙ্গীতের উচ্ছ্বাস উঠিয়া থাকে। তবে ভ্রমর মধু, এবং মক্ষিকা ব্রণ খুঁজিয়া লয়। গানটি এই,—

কার মায়াতে ভুলে রে মন, কর বা কার ভাবনা।
এ যে ধূলার ঘরে পুতুল খেলা; কি খেলা তা বুঝলে না॥
সদা আমার আমার চিন্তা তোমার এ বিকারটা গেল না,

যে তোর হবে আপন ও খেপা মন ভুলেও তায় ভাবলি না ॥
এখন সুখের দোলায় দুলছ সদা, আয়েসে চোক চাইছ না।
যিনি লুকিয়ে থেকে দেচ্ছে দোলা, খোঁজ খবর তার
রাখলে না ॥

তবে যেনে শুনে কেন অবোধ মন
তোমার আজও ভেদাভেদ জ্ঞানটা গেল না।
আছ আত্ম-অহঙ্কারে লিপ্ত এ সংসারে নীচ উচ্চ
জীবকে দেখাচ্ছ মোহ ঘোরে,
কভু হরি বলে ডাকলে না ॥

গায়ক যখন দূর হইতে দূরান্তরে চলিয়া গেল, গানের কথা এবং সুরের একটু রেসও যখন আমার কাণে পঁহুছিল না, তখন আমি নিওক্সে যেমন বসিয়া চিন্তা করিতেছিলাম তেমনই করিতে লাগিলাম। মনে হইতে লাগিল যাঁহাদিগের মানসকন্দর হইতে এই সকল ভাবের গান—এই সকল নিত্য মুক্তির কাহিনী প্রকাশ পাইয়াছে, তাঁহারাও মানুষ, আর যাহারা পাপের প্রলোভনে নারকীয় লীলার নরক আস্বাদনে মুগ্ধ হইয়া অশ্লীল গান গাহিয়া পরিতৃপ্ত হয়, তাহারাও মানুষ। জগতে এ বৈষম্য কেন? মূলে এক ভগবান, শুনিয়াছি তিনি সকলেরই প্রতি সমান করুণাবান্। তবে কাহাকেও উর্দ্ধারের পথে, কাহাকেও অধঃপতনের পথে টানিয়া লওয়া হয় কেন?

সহসা আমার কাণের কাছে কে যেন বলিয়া গেল, তোমার জীবনের দিকে এবং অপরের জীবনের দিকে চাহিয়া দেখ, সব বুঝিতে পারিবে। তুমি আজীবন—সেই বাল্যকাল হইতেই আর এ পর্য্যন্ত স্বামীর শত অত্যাচার সহ্য করিয়াও,—বুকের মাঝে যন্ত্রণার লেলিহান অগ্নিশিখা পোষণ করিয়াও স্বামীর চরণ-চিন্তা পরিত্যাগ কর নাই,—ভগবান্‌কে ডাকিতে ভুল নাই; কাজেই তোমার উন্নতি হইয়াছে, চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে। এখন তোমার হৃদয়, সাধনার পবিত্র ক্ষেত্র; আর ঐ গণিকা—যে আজি কুৎসিত মহাব্যাধিতে গলিতকুষ্ঠেতে হাত পা গলাইয়া পথে পথে মুষ্টিভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে, সেও আগে রমণী ছিল,—তাহারও সুন্দর দেহ ছিল, ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান ছিল। যদি সে সেই জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া আপাতমধুর মুহূর্ত্তেকের সুখকর মোহের পথে পরিচালিত না হইত, তাহা হইলে উহার ঐরূপ দুর্দ্দশা হইত না। অতএব শ্রীভগবান্ করুণাময় ইহা সত্য। মানুষ এই অবনীতলে—এই কর্ম্মক্ষেত্রে স্বাধীনতা লইয়া অবতরণ করিয়াছে,—যে যেমন কর্ম্ম করিবে, সে তেমনই ফল পাইবে। তবে যদি বল, তাহা হইলে ভগবান্ কি করিয়া করুণাময় হইলেন। জীব যদি আপন আপন কর্ম্মানুসারে ফল পাইল, তবে কর্ম্মই প্রধান; কিন্তু তাহা নহে। উন্নতি বা অবনতির যে অবস্থা থাকুক তখন তাঁহাকে—সব ভুলিয়া প্রাণ ভরিয়া ডাকিতে পারিলে,

তিনি উদ্ধার করিয়া থাকেন, পাপী বলিয়া—নারকী বলিয়া কাহার উপর তাঁহার অকরুণা নাই।

হায় মানুষ! এমন দুর্লভ মানবজন্ম গ্রহণ করিয়া, এমন করুণাময়ের রাজ্যে বাস করিয়াও অধঃপতনের দিকে কেন চালিত হও?

সপ্তবিংশ উচ্ছ্বাস

ধ্যানে শক্তি

তোমরা কখনও জাগিয়া স্বপ্ন দেখিয়াছ? আমি একদিন জাগিয়া জাগিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলাম। সে স্বপ্ন বিশৃঙ্খল ঘটনা বা কাহিনীর রাশি নহে, জাগ্রত অবস্থায় কথোপকথনের ন্যায়। শ্রাবণ মাসের মধ্যাহ্নকাল,—আহারাদির পর পুরুষেরা স্ব স্ব কার্য্যে বাহির হইয়া গিয়াছেন। দাস-দাসীগণ আহারাদি করিয়া নীচে নিজের নিজের নির্দ্দিষ্ট ঘরে বিশ্রাম করিতেছিল। বালক-বালিকাগণ উপরের পার্শ্বের ঘরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। আমি যে গৃহে থাকি, তাহার মেঝে একটা শীতল পাটীর উপরে শুইয়া পড়িয়াছিলাম, তাহার পশ্চাদ্ভাগে একটা অবরুদ্ধ গলি, সে দিকে লোকজনের গতাগতি নাই। একটা নিম গাছ বহুদিন হইতে সেই গলির মধ্যে দাঁড়াইয়া, বুঝি কাহার অপেক্ষা করিতে-ছিল।

সে দিন বড় বাদলা। সকাল বেলা হইতে বৃষ্টি নামিয়া সারাদিন তাহার রজত-ধারায় দিক্ সমুদয় সমাচ্ছন্ন করিয়াছিল এবং বাদলের হাওয়া মধ্যে মধ্যে উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া লম্ফ দিয়া
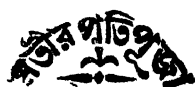
আবেশ ভরে অনুদ্দিষ্ট পথে চলিয়া যাইতেছিল। সেই ধর্ষাচ্ছন্ন নীরব-মধ্যাহ্নে নির্জ্জনগৃহে একা শুইয়া শুইয়া ভাবিতেছিলাম।

কি ভাবিতেছিলাম? ভাবিতেছিলাম সেই এক কথা! ভাবিতে ছিলাম—স্বামী এখন পাপ হইতে ফিরিয়া পড়িয়াছেন। তথাপি আমার হৃদয়ের জ্বালা যায় না কেন? এখন আমার স্বামী অনুগত, সন্তান-সন্ততিগুলি সুস্থকায় ও নিকটবর্ত্তী এবং ভাগিনেয় দেবর প্রভৃতি আজ্ঞানুবর্ত্তী। অর্থ ও দাস-দাসীতে গৃহ পরিপূর্ণ, তবে আমার জ্বালা যায় না কেন?

আমার চিত্তে সর্ব্বদাই যেন দুঃখের জ্বালা জড়াইয়া বসিয়া থাকে। কোথাকার এক দৈত্যের ভীষণ চক্ষুর রক্তদৃষ্টি ভাসিয়া ভাসিয়া উঠে। আমি শান্তি পাই না কেন?

আমি সম্পূর্ণ জাগরিত, কিন্তু হঠাৎ আমার কেমন যেন অবস্থার পরিবর্ত্তন হইয়া গেল। বাহিরের সমস্ত জ্ঞান বিরহিত হইল। এক অতি সুন্দরী কামিনী জ্যোতির্ম্ময়ী সতীর শিরোমণি—আমার শিয়রে আসিয়া দাঁড়াইলেন, আমি ভক্তি ও ভীত চকিত স্বরে বলিলাম—"তুমি কে মা? দাঁড়াইয়া কেন? ঐ আরাম-চৌকিতে উপবেশন কর।" অতি মধুর মৃদুস্বরে তিনি বলিলেন,—"আমি এখনই চলিয়া যাইব, বসিব না।"

আমি। যদি বসিবেন না, আসিলেন কেন?

তিনি। 'তুমি কি এখন আপনার অবস্থা বুঝিতে পার'?

আমি। মা, আমি আপনার কথা কিছুই বুঝিতে পারিলাম না।

তিনি। আবাল্যের সংযম ও পতিকে সৎপথে আনিবার মহৎ চেষ্টার ফলে তোমার হৃদয় পবিত্র হইয়া গিয়াছে। তুমি এখন মানবী হইয়াও দেবতার সিদ্ধিলাভ করিতে বসিয়াছ। তবে প্রাণে অত অশান্তি ভোগ কর কেন?

আমি। তুমি যখন আমার প্রাণের সংবাদ রাখ, তখন প্রাণের জ্বালার খবরই কেন্ না রাখ মা?

তিনি। বুঝিয়াছি, তুমি চাও নিষ্কামের পরম শান্তি। তুমি অবশ্যই অবগত আছ, ভোগে শান্তি আসে না। শান্তি আসে ত্যাগে। গোড়া হইতে সে ত্যাগ প্রার্থনা করিলে না কেন? শ্রীভগবান্ তোমার উপর নিতান্ত প্রসন্ন,—তুমি যখন যাহা চাহিয়াছ, তিনি তখনই তাহা পূর্ণ করিয়াছেন

আমি। কি ত্যাগের প্রার্থনা করিব মা?

তিনি। তোমার স্বামী প্রথম হইতে পাপ করিয়া রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। যদি তুমি তাঁহার আরোগ্য প্রার্থনা না করিতে, তবে তিনি আরোগ্য হইতেন না, শত ডাক্তার কবিরাজেও তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারেন নাই, অবগত আছ;—অবশেষে তোমারই আকুল প্রার্থনায় তিনি আরোগ্য
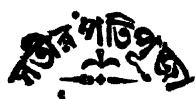
হইয়াছেন। কিন্তু তুমি যদি সে প্রার্থনা না করিয়া, আপনার শান্তি চাহিতে, নিশ্চয়ই তাহাই পাইতে।

আমার হাসি আসিল। কিন্তু হাসিলে পাছে সেই জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী অবজ্ঞাত হন, এই ভয়ে কোন প্রকারে আত্মদমন করিয়া বলিলাম,—"আপনি কি মা আমাকে ছলনা করিতেছেন? জীবনজড়িত আশ্রয়তরুর মূলদেশে কাঠুরিয়া কুঠার আঘাত করিতেছে। আর লতিকা তাহাকে ত্যাগ করিয়া সুখী হইবার আশা করিবে? সে কি জানে না, যে আশ্রয়তরুর পতন হইলে, সেও ছিন্ন ভিন্ন হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবে এবং তখন হয়ত শত পথিকের কঠিন পায়ের চাপে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া পরিশুষ্ক হইবে।"

জ্যোতির্ম্ময়ী মৃদু হাসিলেন। সে হাসিতে যেন শত চাঁদের সৌন্দর্য্য বিকশিত হইল। তারপরে অতি মধুর স্বরে বলিলেন,—"টাকার প্রার্থনা করিলে কেন? তোমার প্রার্থনায় শ্রীভগবান্ তোমাদিগকে অনেক টাকা দিয়াছেন—ব্যবসায়ে যথেষ্ট উন্নতি করিয়া দিয়াছেন।"

আমি। আমার ভোগের জন্য টাকা চাই নাই,—স্বামী সুখী হইবেন বলিয়া টাকা চাহিয়াছি।

তিনি। পুত্র-কন্যাদি চাহিলে কেন?

আমি। পুত্র কন্যা সংসারের বন্ধন, পুত্র কন্যা হইলে

তাহাদিগের স্নেহে—তাহাদের লালন পালনে স্বামী সংসারী হইবেন, পাপপথ হইতে ফিরিবেন এবং সুখী হইবেন,—এই আশীষ।

তিনি। ভাল, তোমার নিজের রোগ হইয়াছিল, তাহা আরোগ্যের প্রার্থনা করিলে কেন? কৃপাময় কমলেশ তোমার কোন প্রার্থনাই অপূর্ণ রাখেন নাই।

আমি। আমার এই ভোগ-দেহ না থাকিলে ভোগাশক্তি-পূর্ণহৃদয় স্বামী আমার কখনই ফিরিতে পারিবেন না। কাজেই আমি আরোগ্য প্রার্থনা করিয়াছিলাম।

জ্যোতির্ম্ময়ী কি বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু আর বলা হইল না; হঠাৎ বাদলার একটা দমকা বাতাস কতকগুলি জলবিন্দু লইয়া উন্মুক্ত জানালাপথে ছড়াইয়া দিল। সেগুলি আমার সমস্ত বিছানা ও গাত্রে আসিয়া পড়িল এবং চমক ভাঙ্গিয়া গেল, জ্যোতির্ম্ময়ীকেও আর দেখিতে পাইলাম না।

আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিলাম। আমার বড় দুঃখ হইতে লাগিল, তেমন রমণীর মূর্ত্তি আর কি কখনও দেখিতে পাইব না? তেমন মধুমাখা সুর আর কি কখনও শুনিতে পাইব না? কে আমায় বলিয়া দিবে, ইহা বাস্তবিক, না অলীক স্বপ্ন; মনের বিকার, অথবা উন্মাদকল্পনার অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশল।

অষ্টাবিংশ উচ্ছ্বাস

—•:•✻•:•—

মানস-পূজা

যখনকার কথা বলিতেছি, তখন আমার স্বামী বাহিরে নিতান্ত ভালমানুষটির মত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ফুলরাশি দিয়া ক্ষতস্থান ঢাকিয়া রাখিলে, তাহা যেমন সহসা লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকে, আমার স্বামীর কৃত পাপরাশিও তখন তেমনই ভাবে লুকায়িত থাকিত। তিনি প্রাণ ভরিয়া—চক্ষুষ্মান্ হইয়া নিজের ব্যবসা কার্য্য দেখিতেন এবং আমাকে দাম্পত্যপ্রেমের ব্যর্থ অভিনয়ে মুগ্ধ রাখিবার চেষ্টা করিতেন। আমি কিন্তু তাঁহাকে এতদিন লক্ষ্য করিয়া আসিয়া—স্বামী দেবতা জানিয়া,—শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ পূজা করিয়া আসিয়া জানিতে পারিতাম—অনুভব করিতে পারিতাম,—তাঁহার সে প্রেমও প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের মধুধারা নহে, তাহা তাঁহারই শিক্ষার মত—ক্রয় বিক্রয়ের দীয়মান ভালবাসা, তাহাতে পাপ, তাপ ও বিষের জ্বালা মিশ্রিত।

মানুষ মোহ-মদিরা একবার পান করিলে বুঝি জীবনে আর তাহা পরিত্যাগ করিতে পারে না। যখন তাহার চৈতন্য হয়,—যখন তাহার জ্ঞানে পঁহুছে, তখনও তাহা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়

না। অন্যায় করিতেছি জানিয়াও ন্যায়বর্ত্মে ফিরিতে পারে না; মনে করে, মরি কেন—অধঃপতনের ভীষণ গুহায় প্রবেশ করি কেন;—কিন্তু কে জানে তথাপি তাহাকে তাহাই করিতে হয়। জ্ঞানীরা বলেন, ইহাই মহামায়ার মহালীলা। তাই সাধকগণ মায়ের দরবারে—মায়ের সিংহাসনতলে—মায়ের চরণসমীপে গললগ্নী-কৃতবাসে দাঁড়াইয়া করুন-কাতর কণ্ঠে কাঁদিয়া কাঁদিয়া গাহিয়া গিয়াছেন :—

তারা! কোন্ অপরাধে, এ দীর্ঘ মিয়াদে,
সংসার-গারদে থাকি বল।
পশিল ছয় দূত তশীল করে কত,
দারা সুত পায়ের শৃঙ্খল॥
দিয়ে মায়া-বেড়া পদে, ফেলেছ বিপদে,
সম্পদে হারালাম মোক্ষফল।
এবার হল না সাধনা ওমা শুবাসনা
সংসার-বাসনা প্রবল॥
(ওমা,) প্রাতঃকালে উঠি, কতই যে মা খাটি
ছুটাছুটি করি ভূমণ্ডল।
হয়ে অর্থ অভিলাষী, আনন্দেতে ভাসি,
সর্ব্বনাশী! জানিস্ কতই ছল॥
(ওমা) আনি ভূমণ্ডলে কতই দুঃখ দিলে,

নীলাম্বরের জলে তুঃখানল।

আর বাঁচিতে সাধ নাই, বাসনা সদাই,

ফণী ধরে খাই হলাহল॥

পুরাণাদিতে পাঠ করিয়াছি, ঋষিগণও বলিয়াছেন যে, ভাল মন্দ বিবেচনা—সদসদ্ বিচার—পাপ পুণ্য জ্ঞান মহাপাতকীরও আছে। তস্কর বোঝে, জানে—চুরি করা মহাপাপ, কিন্তু চুরি করা সে ছাড়িতে পারে না। বেশ্যাসক্তও জানে ইহাও পাপ; তথাপি সে পরিত্যাগ করিতে পারে না। জ্ঞানিগণ ইহার হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছেন এই যে, এই জ্ঞান প্রকৃত জ্ঞান নহে, ইহা বিষয়জ্ঞান মাত্র। প্রকৃত জ্ঞান চিত্ত-শুদ্ধি দ্বারা লাভ হইয়া থাকে। চিত্ত-শুদ্ধি সদাচার দ্বারা সঞ্চয় করিতে হয়। সদাচার মনের বলদ্বারা রক্ষা করিতে হয়, ভীষণ জঙ্গলে প্রবিষ্ট মানব যেমন ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভয় করিয়া চলিয়া থাকে, সর্ব্বদা পাপকে তেমনই ভয় করিয়া চলাই একান্ত প্রয়োজন। সর্ব্বদাই মনকে মৃত্যুর কথা—সজ্জনের সহিত সঙ্গ করার কথা ও ভগবানে ভক্তি কথার কথা স্মরণ করাইয়া দিতে হয়, চিত্ত-শুদ্ধি রাখিবার জন্য পুরাণাদি পাঠ করা কর্ত্তব্য।

পঞ্চবিংশ উচ্ছ্বাস।

—০:*:০—

প্রত্যাহারে মিলন।

সুখদা ঝি যখন বাইরের কাজ কর্ম্ম সারিয়া গৃহমধ্যে মার্জ্জিত বাসনগুলি সাজাইতেছিল এবং সন্ধ্যার দীপ শীতল সুমৃদু সমীর সংস্পর্শে ধীরে ধীরে কাঁপিতেছিল, তখন আমি কৃতাহ্নিক ও স্বামীর চরণচিন্তা সমাধা করিয়া আসিয়া, ঈষদুন্মুক্ত জানালাপার্শ্বে পাতিত কয়েকখানা কৌচের উপর শুইয়া পড়িলাম। নিম্নের রাজপথ দিয়া একজন ভিক্ষুক একটি পয়সা ভিক্ষা চাহিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সুখদাকে দিয়া তাহাকে একটি পয়সা পাঠাইয়া দিলাম। সুখদা জানিত সে সুন্দর গান গাহে। আমি শুনিতে পাইলাম আমাকে গান শুনাইবার জন্য সুখদা তাহাকে একটি গান গাহিতে আদেশ করিল। পয়সাটি প্রাপ্তির খাতিরেই হউক আর সুখদার অনুরোধেই হউক সে গাহিল :—

আমায় ডেকেছ তাই এসেছি,
জনমে জনমে জীবনে মরণে সেধেছ, সাড়া পেয়েছি।
কত ভকতি কুসুম তুলিয়া, কত মনোহর মালা গাঁথিয়া,
শ্রদ্ধার চন্দন ঢালিয়া আহাতে দিয়েছ—

ডাকিলে ভক্তিতে রৈতে নারি, যে হয় ভকত, আমি তাহারি।
যুগে যুগে যুগান্তর ধরি ঋষিমুখে সংবাদ পেয়েছ,
কুঞ্জ সাজায়ে রয়েছ বসিয়ে সারানিশি আমি দেখেছি,
তোমার প্রেমের টানে, প্রাণের গানে,
রাধা নাম সার করেছি।

ভিখারী চলিয়া গেল, আমার মনে হইল, ডাকিলে ঠাকুর দেবতা বশ হন, আর স্বামী দেবতা বশ হন না কেন! ভক্তিতে ভগবান্ আপন হন, স্বামী আপন হন না কেন?

ভোঁ—ভোঁ—ভোঁ! মাথার উপর একটা গোব্‌রে পোকা ডাকিয়া বেড়াইতেছিল, সে অনেক উর্দ্ধে। আমার মনে হইল, একখানি গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম, হাতের অঙ্গুলীগুলি মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ঐরূপ অবস্থায় গোব্‌রে পোকাকে এক মনে আকর্ষণ করিলে তাহার উড়িবার শক্তি রহিত হয় এবং নিম্নে পড়িয়া যায়; আমি তৎক্ষণাৎ তাহাই করিলাম। এক দুই তিন মিনিট না যাইতেই বাস্তবিক সে রুদ্ধগতি হইয়া পড়িয়া গেল!

তবে? তবে কি? তবে ত পথ পাইয়াছি, এক মনে এক প্রাণে স্বামীকে আকর্ষণ করিলে তাঁহার অন্যগতি—অন্যমতি—অন্যভাব রুদ্ধ হইয়া যাইবে। সেই জন্যেই ধুয়া সতী-স্ত্রীর স্বামি-সাধনা। পতি যেমনই হউক সতী রমণীর প্রাণের আকর্ষণে নিশ্চয়ই তিনি ফিরিয়া আসিয়া ধার্ম্মিক হইবেন। এই জন্যই বুঝি গোপীগণের

মধুর রসের ভজনা, এই জন্যই বুঝি তান্ত্রিকের তান্ত্রিকাকর্ষণে যুগল মিলনে দুই হৃদয়ে এক হইয়া যাওয়া।

আমি সেই দিন হইতে সারাজীবনের সাধন শক্তি লইয়া আরও কঠিনতর ভাবে স্বামীকে আমার প্রতি দয়া করিবার জন্য—কুপথ হইতে ফিরিবার জন্য মনে মনে পূজা ও ভক্তি করিতে লাগিলাম, এবং যাহাতে তিনি দৈহিক ও আত্মিক ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ ভাবে বিমুক্ত হইতে পারেন, তজ্জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম।

কালস্রোতে দিনের পর দিন বহিয়া যাইতে লাগিল। মাসের পর মাস বহিয়া যাইতে লাগিল, এইরূপে বর্ষ শেষ হইল।

একদিন প্রভাতশীতল সমীরবাহিত ছাদের উপর ধীরে ধীরে স্বামী আমার পায়চারী করিয়া ফিরিতেছিলেন, আমিও তথায় গমন করিলাম, তিনি যে সেখানে আছেন, তাহা আমি জানিয়া যাই নাই।

তখন স্বামী বিপরীত মুখে চলিয়া যাইতেছিলেন, গতি অতি মন্থর, মুখে চিন্তার রেখা পতিত। কিয়ৎক্ষণ পরে যখন আমার দিকে ফিরিলেন, তখন আমাকে দেখিতে পাইলেন। আমাকে দেখিয়া যেন চমকিয়া উঠিলেন। বলিলেন—ওঃ তুমি!

আমি হাসিয়া বলিলাম, "এ সময় বুঝি আমি না হইয়া অন্য হইলে আনন্দিত হইতে?"

স্বা। কয়েক দিন পূর্ব্বে হইলে তাহাই হইত বটে, কিন্তু সত্য
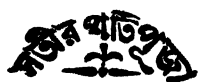
বলিতে কি, এখন হৃদয়ের পরতে পরতে এক নূতন ভাব নূতন চিন্তা, নূতন আকাঙ্ক্ষা জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাতেও যেন পূর্ণানন্দ লাভ করিতে পারিতেছি না। জলাতঙ্ক রোগী যেমন জল-পিপাসায় মরণের পথে চলিয়া যাইতেছে, তথাপি এক বিন্দু শীতল জল পান করিতে সক্ষম হয় না, অধিকন্তু সেই জল দেখিয়া আতঙ্কে মরিতে থাকে, আমারও বুঝি সেইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছে।

স্ত্রী। তোমার কথা ভালরূপ বুঝিতে পারিলাম না।

স্বা। সত্য কথা বলি শোন। আর সত্য বলিতে কুণ্ঠা নাই,—পাপ পথ—পাপ সঙ্গ—পাপ বাসনা—শীতশীর্ণ বৃক্ষশাখা হইতে পত্রগুলি যেমন ধীরে ধীরে সমস্তই ঝরিয়া পড়িয়া যায়। কে জানে কোন্ দেবতার শুভ আশীর্ব্বাদে সেগুলি তেমনই ধীরে ধীরে আমার চিত্ত হইতে ঝরিয়া গিয়াছে। প্রকৃত প্রেম দাম্পত্য ধর্ম্মের মধুর আস্বাদ মিলনের জন্য প্রাণ যেন বড় উধাও হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। কিন্তু জলাতঙ্ক রোগীর মত জানি না, তাহা গ্রহণ করিতে কেন সমর্থ হয় না। সে মিলনে যেন সুখ পাওয়া যায় না, ইহার কারণ তুমি বলিতে পার কি?

স্ত্রী। সত্যই কি তুমি পাপ পথ পরিত্যাগ করিতে পারিয়াছ?

স্বা। নিশ্চয়ই! জীবনে আর মিথ্যা বলিব না। আর পাপ করিব না।

স্ত্রী। আমি তোমার দাসী,—চির সেবিকা, আমাকে যাহা করিতে বলিবে, আমি তাহাতেই প্রস্তুত আছি।

স্বা। আমি তো বলিয়াছি, প্রাণ ভরা পিপাসা,—সম্মুখেই জল, কিন্তু জল দেখিলেই ভয় হয়—স্পর্শমাত্রেই মরিয়া যাইব।

স্ত্রী। এমন কেন হয় আমি বলিতে পারিব না। মনে মনে ইহার একটু মীমাংসার কথা উদয় হইলেও মুখ দিয়া তোমার নিকট বলিতে মহাপাতকের জলদগ্নিতে আমার জিহ্বা গলিয়া খসিয়া পড়িয়া যাইবে।

সে দিন সে সম্বন্ধে সে সময় আর বড় অধিক কোন কথা হইল না। তৎপর দিবস প্রত্যুষে উঠিয়া দেখি, স্বামী আমার গঙ্গা-স্নানে চলিয়াছেন—তত আকাঙ্ক্ষা লইয়া, তত প্রত্যুষে তাঁহাকে কখনও গঙ্গা-স্নানের পথে যাইতে দেখি নাই। জিজ্ঞাসা করিলাম,—একি গো; এ মতি গতি কেন? তিনি হাসিয়া উত্তর করিলেন,—ফিরিয়া আসিয়া বলিব। আমার বুক যুড়িয়া একটা কৌতূহল বসিয়া রহিল।

স্বামী যখন গঙ্গাস্নান করিয়া ফিরিয়া আসিলেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলাম,—কি বলিবেন, বলিয়াছিলেন।

স্বা। আহ্নিক করিয়া পরে বলিব।

স্ত্রী। ওমা! তোমার মুখে একি কথা! তুমি ত কখনও উহা কর নাই! এ মতি গতি কবে হইতে হইল, হঠাৎ কেনই বা হইল?

স্বা। আহ্নিক সমাপ্তির পরে বলিব।

আ। কি আহ্নিক করিবেন? কে মন্ত্র শিখাইলেন? কেইবা দীক্ষাগুরু হইলেন? কেইবা শিক্ষা দিলেন? কেইবা পথপ্রদর্শক?

আমার বিশ্বাস ছিল, স্বামী আমার কথায় হয় পূর্ব্বের ন্যায় ক্রোধান্বিত হইয়া আমার উপর কটূক্তির বিষাক্তবাণ বর্ষণ করিবেন; নয়ত রহস্যজ্ঞানে হাসিয়া আমাকে রহস্যের কথা শুনাইয়া দিবেন; কিন্তু তাহার কিছুই করিলেন না। অতি গম্ভীর বদনে স্থির ভাস্বর তরল উদাসীন নয়নের এক দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল, আমি তাঁহার ভাব দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেলাম। এ কি অবস্থা! জীবনে এমন স্থির মূর্ত্তি তাঁহার কখনও দেখি নাই; বোধ হইল সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযত, চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ, প্রাণাদি বায়ুগুলি তাহাদের স্বাবস্থানস্থানে সম্বদ্ধ। কতক্ষণ কাটিল, তাহা ঠিক করিতে পারি নাই; কারণ তাহার পূর্ব্বে ঘড়ি দেখি নাই, অনুমান আট দশ মিনিট হইতে পারে। ইহার পর প্রাণবায়ু কম্পিত হইয়া দেহের সমস্ত বায়ুকে চালিত করিল, দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, —"শোন বলি, এ পথের প্রযোজক তুমি; তুমি আমাকে সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়া টানিয়া টানিয়া অবশেষে মহাবলের

মহদাকর্ষণে সুপথে আনিয়া ফেলিয়া দিলে। তোমারই কৃপায় আমি পাপের জ্বালা অনুভব করিয়া সে পথ পরিত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছিলাম। কিন্তু তোমাতে আমাতে মিশিতে পাইতেছিলাম না। আমি কুসঙ্গে পড়িয়া—কুকর্ম্ম করিয়া যেরূপ হইয়া গিয়াছিলাম, তাহাতে তোমার মত সতীর—তোমার মত পুণ্যবতীর সঙ্গলাভে আনন্দ অনুভব করিতে পারিতাম না। তোমাকে দেখিলে আমার শরীর যেন শিহরিয়া উঠিত। তাই বড় অনুশোচনায়—বড় অনুতপ্ত হৃদয়ে এক মহাত্মার শরণাপন্ন হই,—তিনি আমাকে উদ্ধার করিয়াছেন। আমি এখন আমার দৈহিক কাশরোগ ও আত্মিক ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছি।

আমি তাঁহার দিকে ভক্তির নয়নে চাহিয়া দেখিলাম—বাস্তবিক তাঁহার দেহ হইতে পাপের জ্বলদগ্নি সরিয়া গিয়াছে। সেখানে পুণ্যের শারদ জ্যোস্না ঢলিয়া পড়িয়াছে। আমার হৃদয় দাম্পত্যপ্রেমের মধুধারায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, তাঁহার চরণতলে বসিয়া পড়িলাম, এবং গললগ্নীকৃতবাসে প্রণাম করিয়া দুই পায়ের ধুলা মুছিয়া লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিলাম। তিনি আমার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইয়া, আমার গণ্ডস্থলে দাম্পত্যের মিলনচিহ্ন মুদ্রিত করিয়া দিলেন।

আমাদের পরস্পরের এইরূপ কথোপকথন হইবার পরেই

স্বামী আহ্নিক করিতে গেলেন ; আহ্নিক করিতে যাইবার উদ্যোগ করিতে যাইয়া বলিলেন—"আমাদের ঘরে কোথায় কম্বলাসন আছে আমি জানি না, তুমি আমায় কম্বলাসন ও একটী পঞ্চপাত্র বা কোশাকুশী সাজাইয়া দাও ; আমি একবার মুদ্রিতনয়নে ভগবানের নিকট প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে—আমার এই সৎপথে উপস্থিত হইবার কে গুরু, কে শিক্ষাদাতা। তোমাকে সত্য কথা বলিতে কি, আমার এ বিষয়ের তুমিই শিক্ষাদাত্রী, তুমিই গুরু। আমি একবার মুদ্রিতনয়নে ভগবানের নিকট প্রাণের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য উপস্থিত হইব। যে করুণাময় শ্রীভগবান্ কৃপা করিয়া আমার অন্ধকারাচ্ছন্ন নেত্রযুগল উন্মীলিত করাইয়া এ সৎপথ দেখাইয়া দিয়াছেন, যিনি তোমার ন্যায় সাধ্বীকে আমার ন্যায় হতভাগ্যকে সৎপথে আনয়ন করিবার জন্য প্রেরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীভগবান্‌কে আমি একবার প্রাণের সহিত ডাকিয়া লই।" এই কথা বলিতে বলিতে অশ্রুধারায় আমার স্বামীর বক্ষঃ প্লাবিত হইয়া গেল, কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল। আমিও তাঁহার চরণযুগল ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপ অতিবাহিত হইল, তারপরে আমি স্বামী দেবতার হৃদয়ের ভাব বুঝিতে পারিয়া বড় ঘরের মেঝের উপরে একখানি কম্বলাসন

বিছাইয়া গঙ্গাজলপূর্ণ একটী পঞ্চপাত্র রাখিয়া দিলাম, উত্তরাস্য হইয়া আমার স্বামী দেবতা সেই আসনে উপবেশন করিলেন, আমাকেও সেই স্থানে বসিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন; আমি তাঁহার বামপার্শ্বে উপবেশন করিলাম। উভয়েই একমনে এক ধ্যানে মুদ্রিতনয়নে শ্রীভগবানের চারু-চরণ-চিন্তায় প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল অতিবাহিত করিলাম।

আমার জানা ছিল, যে জাগ্রত অবস্থায় মানুষ স্বপ্ন দেখে না, নিদ্রিতাবস্থাই স্বপ্ন দেখে; কিন্তু কি জানি, সে অবস্থা আমাদের উভয়ের জাগ্রতাবস্থা কি নিদ্রিতাবস্থা, বুঝিতে পারিলাম না। কে যেন এক বিরাট্ বিশ্ববিমোহন পুরুষ আমাদের উভয়ের কাণে কাণে বলিতে লাগিলেন—তোমাদের ভয় নাই, মানুষ এই জরা-মরণশীল নশ্বরদেহ ধারণ করিয়া চরম আকাঙ্ক্ষায় যে জিনিষটী ভোগ করিতে চায়, তোমরা তাহাই ভোগ করিতেছ।

প্রকাশ্যে আমার স্বামীকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমি চিরজীবন যে পাপাচরণ করিয়াছ, বর্ত্তমানের এই অনুশোচনা-বহ্নিতে তোমার সে সমস্ত পাপ তৃণরাশির ন্যায় ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে; তোমার এ দেহ এখন পুণ্যপূত। তুমি সমস্ত জীবন স্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করিয়া, ভগবত্তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ যে পথের অনুসরণ করিয়া থাকেন, তুমি সেই পথেরই পথিক হইবে। আর সেই বিরাট্ পুরুষ পৃথক্‌ভাবে যেন
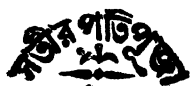
আমার কাণে কাণে কহিতেছিলেন—সতি! তোমার ন্যায় কুললক্ষ্মীগণ সংসারের অনেক কার্য্য করিয়া থাকেন, মানুষ যদি, জলমগ্ন একটা পিপীলিকাকেও উদ্ধার করিতে পারে, তবে তাহাকেই লোকে পুণ্যবান্ বলিয়া থাকে; আর যে মানবের পবিত্রদেহ অধঃপতনের চরম সীমায় উপনীত হইয়া শৃগাল কুক্কুরের দংশনযোগ্য হইতেছিল, তাহাকে যিনি রক্ষা করিতে পারেন, তিনি মানুষ হইলেও দেবতা। তুমি বাস্তবিকই নিজে দেবতা হইয়া চিরজীবন অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া এ যে স্বামীর পূজা করিয়া আসিয়াছ, সেই পূজার ফলে তোমার ইহজগতে ত সমস্ত সম্পদ লাভ হইলই, পরজীবনেও অক্ষয় ও অনন্ত সুখশান্তি সম্ভোগ করিতে পারিবে। অন্যান্য দেবদেবীর পূজায় পত্র-পুষ্প-ফল-ফুল অনেক উপকরণ ও উপঢৌকনের আবশ্যক হয়, কিন্তু তুমি প্রাণের যে পুষ্পদ্বারা নিত্য পতি দেবতার পূজা করিয়া পতি দেবতাকে যথার্থ দেবতা করিতে পারিয়াছ, গুণবতি! ইহাই সতীর পতিপূজা ; এ পূজার ফল চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর।

ইতি—শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু।

সম্পূর্ণ

উক্ত গ্রন্থকারের অতি উৎকৃষ্ট সামাজিক উপন্যাস

অগ্নি সাক্ষী

বঙ্গ সংসারে ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদানল নির্ব্বাপিত করিবার উপদেশে

এ গ্রন্থ পরিপূর্ণ, শিল্কে বাঁধা, মূল্য ২৲।

শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন দাস গুপ্ত এম, এ, প্রণীত

নূতন উপন্যাস

রঞ্জি।

ভাষা, ভাব ও চরিত্র বিশ্লেষণ অতুলনীয়

আশ্চর্য্য ঘটনা মূল্য ১৷৹

আর একখানি উপন্যাস

কুললক্ষ্মী, শৈব্যা, সাবিত্রী সত্যবান প্রভৃতি স্ত্রী-

শিক্ষাপ্রদ উপন্যাস-প্রণেতা

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ রায় প্রণীত

অভিনব সমাজের নিখুঁত চিত্র

ইন্দুপ্রভা।

বঙ্গকুললক্ষ্মী—"ইন্দুপ্রভার" চরিত্রচিত্র পাঠ করিতে করিতে আদ্যোপান্ত ভাষার উচ্ছাসে, ভাবের তরঙ্গে, বিস্ময়ে, উদ্বেগে, কিসে কি ঘটে এরূপ ব্যাকুলতায়—পাঠকপাঠিকাগণ সত্য সত্যই তন্ময় হয়। শিল্কবিজড়িত স্বর্ণমণ্ডিত প্যাডে বাঁধা মূল্য ১৲ এক টাকা।

রায় সাহেব শ্রীকালীকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের

জ্বলন্ত ও জীবন্ত ঘটনা-জাল জড়িত

আশ্চর্য্য উপন্যাস

জাগ্রত স্বপ্ন

বা

দেবলোকে পুনর্ম্মিলন

সিল্কে বাঁধা মূল্য ১।০